মুখপাতঃ—

দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ ও শিক্ষা দেবার জন্যে আমাদের এই উদ্‌যোগ। তারা আনন্দ ও শিক্ষা পেলেই শ্রম সার্থক মনে কর্‌ব।

যাঁরা আমাদের লেখা ও ছবি দিয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ১৩২৯

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

সূচী

চিত্র সূচী

ও

পাঁচখানি রঙীন ছবি এবং ১৩ খানা অন্যছবি।

দেশের

ছেলে মেয়েদের

হাতে

মা যশোদা

[শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে

[শ্রীসরলাবালা দাসী]

জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী পড়ে গেল সাড়ারে ভাই পড়ে গেল সাড়া,
ছুটি'র দিনের নাচন কোঁদন এপাড়া আর ওপাড়া।
যেমনি শুনি জন্মাষ্টমী অম্নি মনে হয়,
মা গো, ছোট্ট নীলমণি,
মা যে তারে খাওয়ান নবণী—
মাথাতে তার ময়ূর পাখা, কপালে তার তিলক আঁকা
হাতেতে তার ছোট্ট পাঁচনী,
হাসিভরা, নোলক পরা ছোট্ট নীলমণি :
নীলমণি সে ডাকে যেন আয়রে ছেলের দল,
কে, কে, আমার সনে গহন বনে খেল্‌তে যাবি বল,
ওভাই আমার শ্রীদাম সুদাম, চল্‌রে বনে চল।
মাগো, সারি সারি নধর বাছুর সাম্‌লা ধলো রাঙ্গি,
লাফিয়ে চলে দলে দলে বন বাদ্‌ড়া ভাঙ্গি ;
আমারো মা পরাণ ছোটে বনে ;
তেমনি হয়ে, শ্রীদাম সুদাম যেতো গোচারণে, রাখাল ছেলের সনে।
জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী পড়ে গেল সাড়ারে ভাই পড়ে গেল সাড়া,
নন্দোৎসবের নাচন কোঁদন দধি কাদার দিনে, এপাড়া ওপাড়া।

যেম্‌নি শুনি জন্মাষ্টমী অমনি মনে হয়, পাথর চাপা বুকে,
শিকল বাঁধা মা দেবকী কাঁদেন মনের দুখে।
নীলমণি মা ফেল্‌লো মেরে হস্তী কুবলয়,
কোর্‌লো না তার ভয় ?
মাগো, তোরে বেঁধে যদি রাখে,
আমি এত ছোট্ট ছেলে ভয় কি আমার থাকে ;
হাতি মেরে গারদ্‌ ভেঙ্গে কংশে করি জয়
তোর সে বাঁধন খুলি মা নিশ্চয় !

হাজার মুষ্টিক, হাজার চানুর আমায় যদি রুখে
আসে মা তাল ঠুকে,
ভয় কি থাকে যখন শুনি মা রয়েছে পড়ে, পাষাণ চাপা বুকে।

জন্মাষ্টমী শুনে মাগো খালি মনে পড়ে,
ভাদুরে তাল পড়া,
রান্নাঘরে ছ্যাঁকর ছোঁকর ভাজা রাশি রাশি
সেই যে তালের বড়া।

নীলমণি মা জন্ম নিলেন মা যশোদার কোলে
যে দিন আঁধার রাতে,
নন্দ রাজার তালবন কি উজাড় হয়ে গেল,
পরের দিনের প্রাতে ?

বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে কেবল ভাজে বড়া,
রাখালের দল পাঁচনী হাতে কেবল ঘোরে, রান্নাঘরের দোরে দোরে
নাইকো তাদের পড়া ?

মাগো সেদিন ইস্কুলেতে চুপে চুপে ভুলো
নিয়ে গেল ভাজা তালের বড়া,
বড়া ভেবে ভুল্‌লো পড়া, গুরুমশাই তারে—

বল্‌লেন, আয় দেখিয়ে দিই পিঠেতে তোর
ভাদুরে তাল পড়া।
তালের বড়া বলে, দিলেন লিখে শেলেটেতে
গোল্লা বড় বড়,—
ভুলো তখন লজ্জা ভয়ে মুখটি করে কালো
কোণে জড় সড়।
মাগো আমি নইকো তেমন ছেলে
আমি জানি হয় নাকো দোষ পড়া সেরে
তালের বড়া খেলে।
জন্মাষ্টমী জন্মাষ্টমী পড়ে গেল সাড়ারে ভাই
পড়ে গেল সাড়া।
খোলের বাদ্যি ওই শোনা যায় এপাড়া ওপাড়া!
মাগো ঠাকুর বাড়ী বাজ্‌নার ধুম লোকের হট্টগোলে
কার সাধ্যি কথা কানে তোলে!
কাল সকালে দিঘির পাড়ে শিউলী সাজি ভরে'
আসবো নিয়ে ঘরে
তুই দিবি মা মালা গেঁথে, সেই মালাটি নিয়ে,
নীলমণিকে আসবো আমি দিয়ে।
শ্রীদাম সুদাম যেমন দিত তেম্‌নি করে
আস্‌বো আমি দিয়ে।
জ্যান্ত যদি হোতো গোপাল—রাখাল নিয়ে
সত্যি যদি যেতো মাগো বনে,
কি যে হ'তো-
রাত্তিরেতে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজিয়ে কেবল ভাবি মনে
রাতে মাগো স্বপন দেখি চুড়ো পরা গোপাল কাছে এসে
আয় বলে ভাই খেলতে যাবি
পাঁচনী হ'তে, বাঁশীহাতে, ডাকে হেসে হেসে।

জন্মাষ্টমী

[শ্রীজলধর সেন]

শিরোণাম দেখিয়াই কেহ মনে করিবেন না, আমি জন্মাষ্টমীর পুরাণ কথা লিখিতে বসিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য সেকালের জন্মাষ্টমীর উৎসবের একটা বর্ণনা দাখিল করা; সুতরাং ইহার মধ্যে ইতিহাস নাই, ধর্ম্মালোচনা নাই, সংস্কৃত শ্লোক নাই,—গবেষণাও নাই;—ইহা একটা উৎসবের চিত্র মাত্র।

'সে-কাল' কথাটার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা বোধ হয় আবশ্যক। আমার উদ্দিষ্ট 'সে-কাল' দ্বাপর যুগও নয়, কলিযুগারম্ভও নয়,— পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর আগের কথা—আমরা যখন বালক ছিলাম সেই সময়ের কথা। তখন আমাদের পাড়াগাঁয়ে এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খুব উৎসব হইত—এখন আর হয় না;—আমরা যে সভ্য হইয়াছি।

উৎসবটা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষেই; কিন্তু, এই উৎসবের নাম জন্মাষ্টমী-উৎসব নহে—আমাদের দেশে এই উৎসবের নাম ছিল 'নন্দোৎসব'। 'নন্দোৎসব' হেডিং দিলেই ঠিক হইত; কিন্তু যাঁদের অনুরোধে পড়িয়া এই কয়টি কথা লিখিতেছি তাঁহারা এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষেই বই ছাপাবেন, এবং সেই বইয়ের নাম দেবেন 'জন্মাষ্টমী'। তাই আমিও এই প্রস্তাবের নাম 'নন্দোৎসব' না বলিয়া 'জন্মাষ্টমী' বলিলাম।

এখন বর্ণনা করি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুপহর রাত্রিতে ঘোর বর্ষাবাদলের মধ্যে মথুরায় মাতুল কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, একথা সকলেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণের জনক বসুদেব মহাশয় কংস রাজার ভয়ে সেই রাত্রিতেই ছেলেটীকে লইয়া যমুনার অপর পারে বৃন্দাবনে গোপরাজ নন্দের বাড়ীতে যান। সেই রাত্রিতেই নন্দরাণী যশোদারও একটী মেয়ে হইয়াছিল। মায়াবলে যখন সকলেই অচৈতন্য, তখন বসুদেব ছেলে মেয়ে অদল-বদল করিয়া ফেলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন নন্দদুলাল। গোপরাজের বাড়ীতে পরদিন মহাসমারোহ এই সমারোহের নামই নন্দোৎসব।

ব্যাপারটা বলা হইল। এখন, আমাদের বালককালে উৎসবটা কি ভাবে সম্পন্ন হইত, তাহাই বলি। আমাদের পাড়াগাঁয়ের এই উৎসবেও নন-কো-অপারেসন ছিল। যাঁরা শৈব বা শাক্ত, তাঁরা এ উৎসবে যোগদান করিতেন না; সুতরাং কালীবাড়ী ও শিবালয়গুলিকে বয়কট করিয়া যে সমস্ত দেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণ, মদনমোহন, গোপীনাথ, গোপাল বিরাজ করেন, সেই সেই দেবালয়েই এই উৎসবের আয়োজন হইত। দেবালয়ের প্রাঙ্গনে সামীয়ানা খাটানোও হইত না, চেয়ার বেঞ্চেরও সমাগম হইত না, নানা স্থান হইতে ভাড়া করিয়া বক্তারও আমদানী করা হইত না, কিঞ্চিৎ জলযোগ (Light refreshmeuc) বা চায়েরও ব্যবস্থা থাকিত না; আর যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সিগারেট নামক পরম উপাদেয় দ্রব্যের অস্তিত্ব ছিল কি না জানি না, এ দেশে আমদানী হয় নাই। সুতরাং, এই নন্দোৎসব উপলক্ষে একেবারে অন্য রকমের আয়োজন হইত।

উৎসবের প্রধান আয়োজনই হইতেছে আহারের—কি একালে, কি সেকালে। তবে, একালে দুইখানি কচুরীর উপর দিয়াই শেষ করা হয়; সেকালে সে যো ছিল না। এই নন্দোৎসব উপলক্ষে অষ্টমীর রাত্রিতে সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই তালের বড়ার আয়োজন হইত; দেবালয়গুলিতে ত সারারাত্রিই বড়া ভাজা হইত। এখনকার মত ত আর বার আনা তেলের সেরও ছিল না, চারি আনা গুড়ের সেরও ছিল না, ছয় পয়সা দিয়া ছোট একটা তালও কিনিতে হইত না। সে সময় আমরা টাকায় ছয় সের খাঁটি সরিষার তেল দেখিয়াছি, তিন পয়সা গুড়ের সের। তাল আবার বাজারে কিনিতে হইবে কেন? যাদের বাড়ীতে তালগাছ আছে, তাহারা সকলকে তাল বিলাইত—এখনকার মত গাছ জমা করিয়া দিলে সেকালের গৃহস্থের নিন্দার সীমা থাকিত না—হয় ত বা একঘরেই হইতে হইত।

যা'ক্ সে কথা। দেবালয়ের গৃহলক্ষ্মীরা সারা রাত্রি এই উৎসবের জন্য তালের বড়া ভাজিতেন। আমরা দেখিয়াছি, বড় বড় দেবালয়ে এই তালের বড়া ভাজিবার জন্য একমন দেড়মন তেলই লাগিত। এখন হিসাব করিয়া দেখুন, কয় হাজার তালের বড়া হইত। আর কিছু নয় শুধু তালের বড়া, আর ফলের মধ্যে শশা আর বাতাবি লেবু। উৎসবের আর কটী আয়োজন কুষ্মাণ্ড—কুমড়া ইতি ভাষা।

এ কুমড়া অবশ্য কাচা অবস্থায় আহার্য্য নহে, এ কথা আর বলিতে হইবে না ; কিন্তু উৎসবের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

এইবার অন্য আয়োজনের কথা বলি। নন্দোৎসবের পূর্ব্বদিন, অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিন দেবালয়-প্রাঙ্গন অতিশয় পরিচ্ছন্ন করিতে হইত। সুধু ঘাস জঙ্গল পরিস্কার করাই নহে ; প্রাঙ্গনের মধ্যে এমন কোন দ্রব্য মাটীর সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে পাইবে না, যাহাতে প্রাঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া গেলে কাহারও শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়। দেবালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতার সহিত ইষ্টক কি লোষ্ট্রখণ্ড, খোলাকুচি প্রভৃতি প্রাঙ্গন হইতে দূর করিয়া দিতেন এবং যদি সেদিন বৃষ্টি না হইত (জন্মাষ্টমীতে সেকালে প্রায়ই বৃষ্টি হইত, ইহার অন্যথা ক্বচিৎ হইত) তাহা হইলে প্রাঙ্গনে জল ঢালিয়া পিচ্ছিল করিয়া রাখা হইত। এমন অনেক দেবালয় আছে, যাহার প্রাঙ্গন শান-বাঁধা। সে সমস্ত প্রাঙ্গনে কিছু মাটী ছড়াইয়া দিয়া, জল ঢালিতে হইত। আসল কথা এই যে, দেবালয় প্রাঙ্গনগুলি কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হওয়া চাই-ই। এতদ্ব্যতীত আর কোন আয়োজনের প্রয়োজন হইত না।

জন্মাষ্টমীর পরদিন অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন প্রাতঃকালেই প্রত্যেক পাড়ার যুবক ও কিশোরেরা নিজের নিজের পাড়ায় সমবেত হইত। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা দেবালয়গুলিতে উপস্থিত থাকিতেন। তখন সাজসজ্জা আরম্ভ হইত। এখনকার মত, সেকালে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে হারমোনিয়াম, বাঁশী প্রভৃতি থাকিবার রেওয়াজ ছিল না,—বিশেষ ও-সকল দ্রব্য তখন পাড়াগাঁয়ে দূরে থাকুক, অনেক সহরেই তেমন বেশী আমদানী হয় নাই। কাজেই সে সনাতন খোল, করতাল ও রামসিঙ্গাই তখনকার সংকীর্ত্তনে প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল। দলের যুবক ও কিশোরগণ সকলেই মালকোচা করিয়া কাপড় পরিয়া লইতেন এবং তাহার উপর কটীদেশে গামোছা বাঁধা। সকলেরই এই বেশ। আমরা তখন দশ এগার বছরের হইলে কি হয়— আমরা ঐ ভাবে মল্লবেশ ধারণ করিতাম।

তখন প্রত্যেক দল সময়োপযোগী গান ধরিয়া দেবালয় অভিমুখে যাত্রা করিত। আমাদের গ্রামেই দেখিয়াছি, আট দশটা সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইত ; দলের সকলেরই মল্লবেশ ! এই সংকীর্ত্তনে বড় ছোট ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার ছিল না ;

সে সিংহ মূর্তি ধর্‌লে

ধনীর সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রধরের পুত্র পর্য্যন্ত একই পর্য্যায় ভুক্ত হইয়া দলে যোগ দিতেন।

তাহার পর দেবালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রথমে গান ও নৃত্য; প্রাঙ্গন পিচ্ছিল—সুতরাং পতন অবশ্যম্ভাবী। গান শেষ হইলে দেবালয়ের বারান্দা হইতে দুই তিনটী কুমড়া ও বাতাবি লেবু সেই সংকীর্ত্তনের দলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত। যাঁহারা সেগুলি অধিকার করিতে পারিতেন, তাঁহারা সেই সকল অমূল্য দ্রব্য কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাঙ্গনে বসিয়া পড়িতেন; অন্যান্য সকলে সেই গুলি কাড়িয়া লইবার জন্য যথারীতি চেষ্টা করিতেন। পিচ্ছিল প্রাঙ্গনে তখন হুড়াহুড়ি, গড়াগড়ি, কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। সে-যে কি সুন্দর দৃশ্য! এখনও মনে হইলে আনন্দ হয়। শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকিলে এ ব্যাপারে কেহ যোগ দিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু সে-কালে পল্লী-অঞ্চলে এ শ্রেণীর যুবকের অভাব ছিল না; তখন ত ম্যালেরিয়া দেশে প্রবেশলাভ করে নাই; তখন ত এমন দুর্দ্দিন আসে নাই; তখন আমাদের পল্লী-অঞ্চলের লোকে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইত; তখন পুকুরে মাছ ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, বাগানে তরিতরকারী ছিল, মরাইয়ে ধান ছিল; তাই শরীরেও শক্তি ছিল।

এই কাড়াকাড়ি কুস্তি লড়াইয়ের পর আহার। সেই কর্দ্দমাক্ত দেহেই কর্দ্দমাক্ত হস্তে তালের বড়া দেওয়া হইত; আর সেই কর্দ্দমলিপ্ত হস্তেই সকলে তালের বড়া আহার করিতেন। আর, সে কি একটা-আধটা—এক এক জন এক ডজন, দেড় ডজন। এই রকম পাঁচ-সাতটা দেবালয়ে কর্দ্দম-ক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ, আর কম করিয়া হইলেও এক এক জন ৫০।৬০টা তালের বড়া ও কতকগুলি শশা ভোজন করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে নদীতে বা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন। একজনেরও কোন অসুখ করিত না, কাহারও পেটের অসুখ হইতে দেখি নাই,—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ক্ষীণদৃষ্টি কাহারও ছিল না।

সে নন্দোৎসবের আনন্দ, সে মল্লযুদ্ধ, সে বলিষ্ঠ দেহ, সেই অপরিমিত ভোজন এখন আর দেখিতে পাই না—নন্দোৎসবই উঠিয়া গিয়াছে।

এখনকার ছেলেরা এই বর্ণনা পড়িয়া বলিবেন, উঠিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে।

কি অসভ্যতা! এখন কি ও-সব চলে? নন্দোৎসবের ব্যাপার অসভ্যতা কি সভ্যতা, তার বিচার না হয় নাই করিলাম। কিন্তু এখন সে গালভরা হাসি কৈ? সে আনন্দ-কোলাহল কৈ? সে ভোজন-পটুতা কৈ? আর সে সহৃদয়তা কৈ?

হয়ত অমন করিয়া কাদা মাখিয়া ভূত সাজিয়া লাফালাফি করাটাই অসভ্যতা বলিয়া এখনকার ছেলেদের মনে হয়। কিন্তু যে ইউরোপের অনুকরণে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা গঠিত, সেই ইউরোপ কিন্তু এখন বলিতেছেন যে, খুব কাদা মাখিয়া স্নান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী। সুতরাং আশা করা যায়, পুনরায় কাদামাখা বিলাতী গুরুর দেখাদেখি এ দেশেও সুরু হইবে এবং ইহাও আশা করা যায় যে, জন্মাষ্টমীর পরদিনের নন্দোৎসবও অসভ্যোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তুমি।

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।]

তুমি ডাকলে আমায় মা বলে!
রুদ্ধ পাষাণ খসিয়ে নিলে
সুধারধারা উচ্ছলে!
তুলে রাখা যতন করে
যত নণী ছিল ঘরে
তাই দিয়ে দিয়েছি ভরে'
দুটি ছোট করতলে!
চাইলে পরে মুখের' পরে
তাইতে পরাণ অম্নি ভরে'
চোখের জলে হাসির আলো
মিশিয়ে দিলে কোন্ ছলে?

খরগোশ জোড়া রাজাকে দিল

আদুরী।

[শ্রীসুবিনয় রায়]

তার নাম ছিল আদুরী ;—বাবুদের রসুয়ে বামুন সে। নামটি যেমন, লোকটিও তেমন। আহ্লাদী আদুরে গোপাল, নাদুসনুদুস চেহারা, বুদ্ধিটাও বেজায় মোটা! স্বভাবটি কিন্তু বড় ঠাণ্ডা ;—রাগ তার নাই বল্‌লেই হয় ;—দিনরাত হেসেই আছে। কাজের বেলায় একেবারে আনাড়ি,—যা' রাঁধতে দেবে তাই মাটি কর্‌বে।
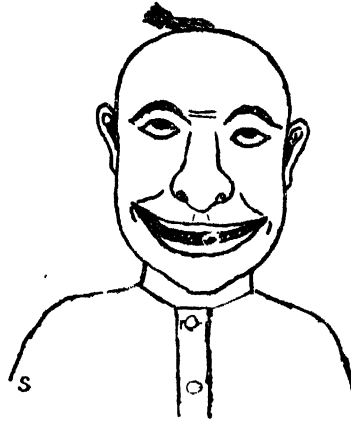
বাবুদের তো তা'কে নিয়ে প্রাণান্ত হয় ;—কাজও করতে পারে না, অথচ, নিতান্ত ভালমানুষ ব'লে তাড়াতেও মায়া হয়। রান্না করতে বল্‌লে, হয় পুড়িয়ে ফেল্‌বে, না হয় কাঁচাই রেঁধে রাখ্‌বে। মসলার তো কোন হিসাবই নাই। একদিন তা'কে দৈ পাত্‌তে বলা হ'লো। পাশের বাড়ীর ঠাকুর খুব ভাল দৈ পাত্‌তে জানে ব'লে বাবু বল্‌লেন, "ওরে আদুরী! পাশের বাড়ী গিয়ে দেখে আয় তাদের ঠাকুর কেমন ক'রে দৈ পাতে।" আদুরী "যে আজ্ঞে!" ব'লে চ'লে গেল।

পরের দিন বাবু দৈ মুখে দিয়েই "থু! থু!" ক'রে ফেলে দিলেন। তাঁর জিভ পুড়ে গেল! আদুরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌ল, "আজ্ঞে ওদের চাকরকে

দেখ্‌লাম, দুধের মধ্যে একটা সাদা-মতন জিনিষ ঢেলে দিল; তার নাম দম্বল। আমি মনে কর্‌লাম চূণ ঢেলেছে, তাই আমিও চূণ দিয়ে দৈ পেতেছি।” বাবুরা আর কি বলেন!

আর একদিন তাকে বলা হ'লো, “ওরে আদুরী! তুই তো মাংস রাঁধ্‌তে প্রায়ই গোলমাল করিস্‌;—কোন দিন কাঁচা থাকে, কোন দিন ঝোল বেশী রাখিস্‌, কোন দিন পুড়ে যায়;—তা' ছাড়া, মসলা তো একদিনও ঠিক হয় না। পাশের বাড়ীর ঠাকুর কেমন সুন্দর মাংস রাঁধে দেখ্‌তো। যা! আজকে তোকে ছুটি দিলাম;—ওদের ঠাকুরের কাছে মাংস রান্না করতে শেখ্‌ গিয়ে!” আদুরীও “যে আজ্ঞে!” ব'লে রওনা হয়ে গেল।

পরের দিন বাবুরা খেতে ব'সেছেন, আদুরী মাংস রেঁধে এনেছে। বড় বাবু তো মুখে দিয়েই “ওয়াক্‌! থু!” ক'রে ফেলে দিলেন। মাংস একেবারে কাদায় ভরা! আদুরীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌ল, “আজ্ঞে হুজুর! ওদের ঠাকুরকে দেখ্‌লাম, রান্না হবার পর একটা কাদাটে জিনিষ মাংসে ঢেলে দিল—তাকে ‘গরম মসলা’ না কি জানি বল্‌ল;—আমিও তাই মাংস রেঁধে তার মধ্যে আচ্ছা ক'রে কাদা ঢেলে দিয়েছি। দেখি কেমন ক'রে রান্না খারাপ হয়!” বাবুদের তো চক্ষুস্থির!

সেদিন রাত্রে বাবুরা বিছানায় শুয়ে পরামর্শ কর্‌লেন যে, পরের দিন ভোর বেলা আদুরীকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে, তাঁরা চুপি চুপি জিনিষপত্র নিয়ে পালাবেন। আদুরী ফিরে এসে তাঁদের আর দেখ্‌তে পাবে না।

ভোরবেলা আদুরীকে ফর্দ্দ দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে বাবুরা তাড়াতাড়ি জিনিষ বাঁধ্‌তে লাগ্‌লেন। ইতিমধ্যে কখন আদুরী চুপি চুপি বাজার থেকে ফিরে এসে পড়েছে। বেচারা রাত্রে বাবুদের কথা শুনেছে, আর তার প্রাণ অস্থির হ'য়ে আছে। সে এসেই একটা বিছানার মধ্যে ঢুকে রইল, কেউ টেরও পেল না। কিছুক্ষণ বাদে বাবুরা পিছনের খিড়্‌কি দরজা দিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়্‌লেন।

অনেক দূর গিয়ে এক গাছতলায় সকলে বিশ্রাম করতে বস্‌লেন। আদুরী বেচারা বিছানার ভিতর দম আট্‌কে মারা যায় আর কি! অনেকক্ষণ সহ্য করে

থেকে শেষটায় আর সইল না ;—হঠাৎ বিছানা থেকে বেরিয়ে এল। বাবুরা তো দেখে একেবারে অবাক! কারো মুখে আর কথা সরে না। তারপর সকলে বল্‌লেন, "তাহ'লে তুইও আমাদের সঙ্গেই চল।" আদুরীও সঙ্গে চল্‌ল।
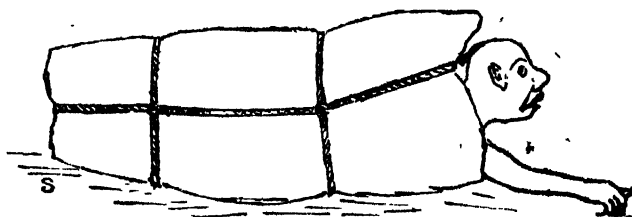
কিছুদূর গিয়ে একটা নদীর ধারে একটা কচ্ছপ দেখা গেল। আদুরী সেই কচ্ছপটাকে খপ্‌ ক'রে ধ'রে নিয়ে চল্‌ল। সকলে বল্‌ল, "এটা কি কর্‌ছিস?" আদুরী বল্‌ল, "পরে কাজে লাগ্‌বে।"

আরো খানিকদূর গিয়ে একটা বাজার দেখা গেল। সেখানের একটা দোকান থেকে আদুরী একটা ঢাক নিয়ে দে ছুট্‌! সকলে 'ধর্‌ ধর্‌' ব'লে তাড়া কর্‌ল, কিন্তু আদুরী মোটা হ'লেও খুব দৌড়াতে পার্‌ত ; কাজেই কেউ তাকে ধর্‌তে পার্‌ল না। এই রকম ক'রে কিছুদূর যায়, আর এক একটা দোকান থেকে জিনিষ নিয়ে পালায়। এই ভাবে সে একটা মোটা দড়ি, একটা কোদাল আর এক হাঁড়ি চূন জোগাড় ক'রে নিল।

পথ চল্‌তে চল্‌তে সকলেই আদুরীকে ঠাট্টা কর্‌ছে, আর বল্‌ছে. "চুরি কর্‌তি তো টাকাকড়িই কর্‌তি, না, যত রাজ্যের বাজে জিনিষ নিয়েছিস্‌!" আদুরী কোন কথাই বলে না ; সে এক মনে নিজের বোঝা ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে।

আরো খানিকদূর গিয়ে খুব গভীর জঙ্গল পাওয়া গেল ; ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দও নাই। ক্রমে সন্ধ্যাও হয়ে এল। তখন সকলেরই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ; গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। কি ভাগ্যি যে তখনই সাম্নে এক প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা গেল,—সেখানে পৌঁছে সকলে হাঁপ ছেড়ে বাচ্‌ল। কিন্তু, সেখানে গিয়েও নিশ্চিন্ত হবার জো নাই। বাড়ী তো খুবই সুন্দর, কিন্তু সেখানে একটিও

লোক নাই ; কি রকম বুনো গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলো ঘর বন্ধও রয়েছে।

বাবুরা তো ভয়ে ঘুমাতেই পার্ ছেন না ; অথচ, সারাদিন পথ চলে তাঁদের চোখ ঘুমে ঢুলে আস্ ছে। তখন আদুরী সাহস দিয়ে বল্ ল, "আমি থাক্ তে আপনাদের ভয় কিসের ? সারারাত আমিই জেগে পাহারা দেবো। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান।"

বাবুরা তখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্ লেন ; আদুরী দরজা বন্ধ ক'রে পাহারা দিতে লাগ্ ল। দু' এক ঘণ্টা পরেই সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখ্ তে পেল একটা প্রকাণ্ড বিদ্ ঘুটে রাক্ষস আস্ ছে। দেখেই তো তার চক্ষুস্থির! সে কিন্তু ভড়্ কা'বার পাত্র নয়। অপেক্ষা ক'রে দেখ্ তে লাগ্ ল রাক্ষসটা কি করে।

বাড়ীর কাছে এসে, দরজা বন্ধ দেখে রাক্ষসটা চেঁচিয়ে উঠ্ ল, "ঘরের ভেতর কেরে ? মানুষের গন্ধ পাচ্ছি যে!"

আদুরী বল্ ল, "আদুরী আর তার বাবুরা!"

রাক্ষস বল্ ল, "তোরা কেমন মানুষ রে ?"

আদুরী বল্ ল, "আমরা ভয়ানক মানুষ!"

রাক্ষস বল্ ল, "হ্যাঁ! ভয়ানক মানুষ না আরো কিছু! তোরা হাসিস্ কেমন করে রে ?"

আদুরী তখনই 'ডুম্ ডুমাডুম্ ডুম্' ক'রে এয়া জোরে ঢাক বাজিয়ে দিল। রাক্ষস সেই আওয়াজ শুনেই "বাবারে! ভয়ানক মানুষ রে!" ব'লে যে দৌড় দিল, আর ফিরেও তাকা'ল না।

আরো খানিক বাদে আরেকটা রাক্ষস এল। সেটা আগেরটার চেয়েও বিচ্ছিরি দেখ্ তে। সেও এসে ঐ রকম সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, তারপর বল্ ল, "হ্যাঁ! মানুষ আবার ভয়ানক হয় নাকি! তোদের থুতু কি রকম দেখ্ লে বল্ তে পারি ভয়ানক না কি।"

আদুরী অম্ নি এক গাদা চূণ থ্যাপ্ করে রাক্ষসের দিকে ছুঁড়ে মার্ ল। রাক্ষস তো চূন দেখেই আঙ্গুলে ক'রে একটু মুখে দিয়েছে,—আর অম্ নি 'থু! থু' ক'রে চূণ ফেলে উঠে চোঁচা দৌড়!

আরো খানিক বাদে আরো ভীষণ রকমের এক রাক্ষস এসে হাজির। তার মেঘের মত গলার আওয়াজ, কুলোর মতন কাণ, মূলোর মতন দাঁত চুলোর মতন চোখ। সেও এসে চেঁচামেচি ক'রে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌ল, "তোদের চুল কি রকম দেখা তো।"

আদুরী অম্‌নি সেই দড়ি গাছটা ছুঁড়ে রাক্ষসের গায়ে ফেল্‌ল। রাক্ষসও "ওরে ববাস্‌ রে!" ব'লে উঠে দে দৌড়।

এবারে এল একটা আরো ভয়ানক রাক্ষস। সেও এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌ল, "তোদের চুল তো দেখিয়েছিস্‌; এখন মাথার উকুন দেখাতে পারিস্‌ তো বুঝি।"

আদুরী অম্নি সেই কচ্ছপটাকে ধপ্‌ ক'রে তার সাম্নে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। রাক্ষস তা'কে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে গিয়েছে আর কচ্ছপও কটাস্‌ ক'রে রাক্ষসের আঙ্গুলে কাম্‌ড়ে ধ'রেছে। কচ্ছপের কামড় কি আর সহজে ছাড়ান যায়? রাক্ষস তো হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে অস্থির! অনেক কষ্টে কচ্ছপের কামড় ছাড়িয়ে সেই যে উঠে দৌড় দিল আর সে ফির্‌ল না।

এর পর যে রাক্ষসটা এল, তার মতন বিকট বিশ্রী রাক্ষস আর দেখাই যায় না। যেম্নি বিকট তার চেহারা তেমনি বিকট তার গলার আওয়াজ! সে এসেই বল্‌ল,

"তোদের হাসি শুনিয়েছিস্‌, থুতু দেখিয়েছিস্‌, চুল দেখিয়েছিস্‌, উকুন দেখিয়েছিস্‌,—এবার নখ দেখা তো কি রকম! ভারি তো মানুষ এসেছে সব; তাদের আবার তেজ দেখ না!"

আদুরীও অম্‌নি সেই কোদালটা রাক্ষসের নাক-বরাবর ধাঁই ক'রে ছুঁড়ে মেরেছে! লাগ্‌বি তো লাগ্‌ একেবারে নাকের ডগায় গিয়ে কোদাল ব'সে গেল আর নাকের এক চাক্‌লা বোঁ করে উড়ে গেল। রাক্ষস তো হাঁউ মাঁউ কাঁউ ক'রে যা' দৌড় দিল, তা, আর বল্‌বারই নয়। যাবার সময় ব'লে গেল, "দোহাই তোমাদের! আমাদের আর মেরো না! এ বাড়ী তোমাদেরই থাক! আমরা আর এ দেশে আস্‌ছি না।"

এবারের গোলমালে বাবুদের সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু রাক্ষসের গলার বিকট আওয়াজে ভয়ে তাদের নড়্‌বারই আর শক্তি নাই। রাক্ষসের শেষ কথাগুলো শুনে তাঁদের প্রাণে ভরসা হ'লো; কিন্তু তবুও তাঁরা উঠতে সাহস পেলেন না। ভোর হ'লে সকলে উঠে আদুরীর কাছে গেলেন;—সে তখন নিশ্চিন্ত মনে প'ড়ে ঘুম দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আদুরী ঘুম থেকে উঠে তাঁদের আগাগোড়া সব ঘটনা বল্‌ল। তখন সকলেই আদুরীর উপর ভারি খুসী! তারই জন্য তাঁদের সকলের প্রাণ বেঁচে গেছিল সেদিন।

তারপর সকলে মিলে সেই বাড়ীর চারিদিক ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কত হীরা, কত মণিমুক্তা, কত মোহর যে সেই বাড়ীতে ছিল, তার আর কোন ঠিকানাই নাই! আদুরীকে তখন থেকে আর কোন কাজ কর্‌তে হয় না। অনেক চাকর-বাকর, ঠাকুর, দরোয়ান তার হুকুমে কাজ করে।

প্রথম শোক

(ইংরাজী হইতে)

(শ্রীকালিদাস রায়)

"ভাইটিকে মোর ডেকে দাও মাগো
খেলিতে যে আমি পারিনা একা,
ফুলের সময় এসেছে যে ফিরে
তার কেন মাগো নেইক' দেখা ?
মোদেরি লাগানো বাগানের গাছে
ফুলে ফুলে আর নেই যে ঠাঁই,
ডাক' মা তাহারে, গাছ ফলভারে
ভেঙে পড়ে, হাতে ছুঁতে যে পাই।"
"বাছারে আমার, তব আহ্বান
শুনে আসিবেনা আর সে ফিরে,
মধুমাসসম যেমুখ হাসিল
ধরায় সে মুখ হাসিবে কিরে ?
গোলাপের মত জীবন তাহার
গোলাপেরি মত ফুরায়ে গেল,
সে যে আছে বাছা সুরনন্দনে
আজি তুমি হেথা একলা খেল"।
"এত ফুল পাখী ছেড়ে গেছে চলে ?
আমি তবে হায় বৃথাই ডাকি ?
ভরা ফাগুণের সুখের মেলায়
ফিরিবেনা আর পরাগ মাখি ?
গোঠে মাঠে ঘাটে বেড়ান কি শেষ ?
মিছে কেন সাঁজে প্রদীপ জ্বালো ?
সে ছিল যখন, কেন বুকে ধরে'
আরো প্রাণ ভরে' বাসিনি ভালো ?"

শ্রীদর্শনের উপখ্যান

(কথাসরিৎ সাগরের গল্প)

[শ্রীকুলদারঞ্জন রায়]

ত্রিগর্ত্তদেশে পবিত্রধর নামে নিতান্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দরিদ্র হইলেও তিনি খুব তেজস্বী এবং উচ্চ বংশের সন্তান, ধনী আত্মীয়স্বজনও তাঁহার অনেক ছিল। একদিন তিনি ভাবিলেন—"গরীব হইয়া ধনী আত্মীয়দের মধ্যে বাস করা এক মহাবিপদ! সামান্য চাকুরী করিলেও অপমানের কথা আর ভিক্ষা করিলেও কথাই নাই! সুতরাং দূরে কোন বনে গিয়া সাধন করিয়া যক্ষ সিদ্ধি লাভ করিব।" এই ভাবিয়া পবিত্রধর বহু দূরে এক বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি গুরুর নিকট যক্ষ সাধনের মন্ত্র শিখিয়াছিলেন; সেই মন্ত্র জপ করিয়া বহুদিন সাধন করিলে, হঠাৎ একদিন পরম সুন্দরী এক যক্ষ কন্যা আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আসিয়াই বলিল—"ঠাকুর আমি আসিয়াছি, এখন কি করিতে হইবে বল।" পবিত্রধর বলিলেন—"সুন্দরী! তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিব।" তখন যক্ষিণী সম্মত হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল তবু তাঁহাদিগের সন্তান জন্মিল না। সেজন্য ব্রাহ্মণের মনে বড় দুঃখ, রাতদিন বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকেন, মুখে কথাটি নাই! ইহা দেখিয়া একদিন যক্ষকন্যা বলিল—"ঠাকুর আমি তোমার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। এতদিনেও পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলে না, তাই তোমার মনে কষ্ট! যাহা হউক, তুমি আর দুঃখ করিও না, শীঘ্রই আমাদের দুঃখ দূর হইবে। এখন আমি একটি গল্প বলিতেছি, শুন –

"দাক্ষিণাত্যে এক গভীর তমাল বনে "পৃথূদর" নামে প্রসিদ্ধ এক যক্ষ থাকেন, আমি তাঁহারই একমাত্র কন্যা—সৌদামিনী। পিতার সহিত আমি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন আমার সখী "কপিশভ্রূ"র সঙ্গে আমি কৈলাস পর্ব্বতে খেলা করিতেছিলাম এমন সময় "অট্টহাস" নামক পরমসুন্দর এক যক্ষ

প্রভুর ছেলের হাত ধরে বেড়ান

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ২৭৪।

যুবককে দেখিতে পাই। তাঁহাকে দেখিয়াই, যেমন আমি মুগ্ধ হইলাম তেমনি তিনিও আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আমাদিগের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, পিতা অট্টহাসের সহিত আমার বিবাহ স্থির করিলেন—বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল। ইহার পর আমরা চলিয়া আসিলাম, অট্টহাসও সন্তুষ্টচিত্তে বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন সখী কপিশভ্রূ আমার নিকট আসিলে, দেখিলাম, তাহার মুখখানা বড় মলিন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"সখি! বড় দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছি। এখানে আসিবার সময় পথে হিমালয় পর্ব্বতে এক বাগানের মধ্যে দেখিলাম—তোমার ভাবী স্বামী অট্টহাসকে তাঁহার বন্ধুগণ কুবের সাজাইয়াছে এবং তাঁহার ছোট ভাই দীপ্তশিখাকে নলকুবের সাজাইয়া, খেলার ছলে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। এই সময়ে ঘটনাক্রমে, যক্ষরাজকুমার নলকুবের শূন্যপথে বেড়াইতে ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া রাগিয়া আগুন! এবং অট্টহাসকে ডাকিয়া শাপ দিলেন—"দুষ্ট! ভৃত্য হইয়া তুমি প্রভু সাজিয়া তামাসা করিতেছ? যাও, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ হইয়া জন্ম লও।'

এই দারুণ শাপ শুনিয়া অট্টহাস নলকুবেরের পায়ে পড়িয়া, অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর, তিনি বলিলেন—"বলিয়াছি যখন, তখন মানুষ হইয়া তোমাকে জন্মিতেই হইবে। যাহা হউক, মানুষ জন্মেও তুমি সৌদামিনীকেই বিবাহ করিবে এবং তোমার ছোট ভাই দীপ্তশিখা তোমার পুত্র হইয়া জন্মিবে। এই ঘটনার পর আমার শাপও আর থাকিবে না।' সখি! নলকুবের এই কথা বলামাত্র, অট্টহাস হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন আর আমিও তোমাকে সংবাদ দিতে চলিয়া আসিয়াছি।"

সখীর মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া আমার দুঃখের সীমা রহিল না এবং তখন হইতে আমি অট্টহাসের সহিত মিলনের আশায় দিন কাটাইতে ছিলাম। ঠাকুর! তুমিই সেই অট্টহাস, ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম লইয়াছ আর আমি সেই যক্ষকন্যা সৌদামিনী—তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছ। সুতরাং মনের দুঃখ দূর কর—শীঘ্রই আমাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।"

সৌদামিনীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন! কিছুকাল পরে তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের শাপ দূর হইয়া তিনি পুনরায় অট্টহাসের রূপ ধরিলেন। তখন তিনি যক্ষকন্যাকে বলিলেন— "আমাদের শাপ দূর হইয়াছে—চল এখন যক্ষলোকে চলিয়া যাই।"

যক্ষকন্যা বলিল—"আমাদের এই শাপগ্রস্ত পুত্রের একটা কিছু গতি না করিয়া কিরূপে চলিয়া যাইব?" তখন অট্টহাস ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া উপায় স্থির করিলেন, এবং বলিলেন—"নিকটেই দেবদর্শন নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার পুত্রসন্তান নাই। তিনি পুত্রলাভের জন্য অগ্নির পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, অগ্নিদেব তাঁহাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন—'শীঘ্রই তুমি দত্তকপুত্র লাভ করিবে এবং তাহার কল্যাণে তোমার দুঃখ কষ্ট থাকিবে না।' অগ্নির বরে দেবদর্শন দত্তকপুত্র লাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব চল, আমাদের এই সন্তানকে নিয়া তাঁহাকে দেই।" এই বলিয়া অট্টহাস একটি পেঁটরার মধ্যে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা ভরিয়া, তাহার উপরে শিশুকে রাখিলেন এবং মুক্তার মালা দিয়া পেঁটরার মুখটি বাঁধিলেন। তারপর রাত্রে সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন পেঁটরাটি তাঁহাদের দরজায় রাখিয়া, অট্টহাস স্ত্রীর সহিত দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী দরজায় পেঁটরাটি দেখিয়া একেবারে অবাক্! তারপর পেঁটরা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি শিশু রহিয়াছে— চাঁদের মত সুন্দর তাহার মুখখানি আর মোহর, মণি, মুক্তায় পেঁটরা ঝক্ ঝক্ করিতেছে! তখন হঠাৎ ব্রাহ্মণের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল—তিনি বুঝিতে পারিলেন, অগ্নিদেব দয়া করিয়া এই শিশুটিকে দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাঁহারা পরম যত্নে শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুর নাম রাখিলেন—শ্রীদর্শন। বড় হইয়া শ্রীদর্শন রূপে, গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে এবং অস্ত্র বিদ্যায় অতিশয় প্রসিদ্ধ হইল।

কিছুকাল পর দেবদর্শন তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া, গয়াতে প্রাণত্যাগ করিলে, সেই সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণীও আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিলেন। সংসারে শ্রীদর্শনের

আপনার লোক কেহ রহিল না। ক্রমে শ্রীদর্শন দুষ্ট লোকদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিল। কোথায় বা রহিল তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আর কোথায় বা রহিল তাহার শাস্ত্রজ্ঞান! অবশেষে সে আরম্ভ করিল জুয়াখেলা! দেখিতে দেখিতে সে ধন-সম্পত্তি সব উড়াইল—দুই মুষ্টি অন্ন সংস্থানেরও উপায় রহিল না।

একদিন তাহার দুর্দ্দশার চরমসীমা উপস্থিত হইল। ক্রমাগত তিন দিন যাবৎ সে জুয়ার আড্ডায় অনাহারে পড়িয়া আছে, পরনের কাপড় এতই ময়লা যে বাহিরে যাইতেও সে লজ্জা বোধ করে। অন্যে দয়া করিয়া খাইতে দিলে, লজ্জায় সে তাহা গ্রহণ করে না! এই জুয়ার আঁড্ডায় পদ্মঘোষ নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র "মুখরক"ও ছিল। মুখরক শৈশবে জুয়াখেলায় মাতিয়া, বাড়ীঘর ছাড়িয়া বিদেশে শ্রীদর্শনের এই জুয়ার আড্ডায় আসিয়া জুটিয়া যায়। এদিকে তাহার মাতা, পুত্রের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলে পর, তাহার পিতাও একমাত্র কন্যা "পদ্মীঠাকে" লইয়া হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন।

শ্রীদর্শনের এই দুরবস্থার সময় মুখরক বলিল—"বন্ধু! জুয়ায় মত্ত হইলে লোকের এরূপ অবস্থা হইয়াই থাকে কিন্তু তাহা বলিয়া তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনাহারে ক্লেশ পাইবে কেন? জ্ঞানী লোক কি শরীরকে মিছামিছি কখনও কষ্ট দেয়? বিপদে ধৈর্য্য রাখিতে পারিলে শেষে দুঃখ দূর হইবেই হইবে।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া শ্রীদর্শন বলিল—"তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, কিন্তু জুয়াখেলার দরুণ আমার এতই দুর্নাম ঘটিয়াছে যে, লজ্জায় আমি সহরে বাহির হইতে পারিতেছি না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ রাত্রেই আমাকে এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দিবে, তবেই আমি আহার করিতে পারি।" মুখরক এ কথায় রাজি হইয়া তাহাকে কিছু খাদ্য আনিয়া দিলে, শ্রীদর্শন তাহা খাইল এবং খাওয়ার পরই বিদেশে যাত্রা করিতে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। মুখরক শ্রীদর্শনকে অত্যন্ত ভালবাসিত সুতরাং সেও তাহার সঙ্গে গেল।

এই সময়ে শ্রীদর্শনের যক্ষ পিতামাতা—অট্টহাস ও সোদামিনী আকাশে বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীদর্শন ও মুখরক বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। অর্থের অভাবে পুত্রকে বিদেশে যাইতে দেখিয়া, তাঁহাদের মনে বাৎসল্য জাগিয়া

উঠিল এবং আকাশে অদৃশ্য থাকিয়াই শ্রীদর্শনকে ডাকিয়া বলিলেন—"শ্রীদর্শন! তোমার মা ঘরে মাটির নীচে অনেক ধন পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। সেই ধন তুলিয়া লইয়া তুমি মালব দেশে চলিয়া যাও। সেখানে সুসেন নামে এক ক্ষমতাবান্ রাজা আছেন, তিনি শৈশবে জুয়াখেলিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন! সেজন্য, বড় হইয়া রাজ্য পাইলে পর, জুয়াখেলায় যাহারা সব হারাইয়াছে তেমন লোকদিগের জন্য, একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি সেই আশ্রমে যাও—তোমার দুঃখ দূর হইবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া শ্রীদর্শন বন্ধুর সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া গেল এবং মাটির নীচের সেই ধন তুলিয়া লইয়া, সেই রাত্রেই উভয়ে মালব যাত্রা করিল।

সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়া, তাহারা সুন্দর একটি জলাশয়ের ধারে গিয়া উপস্থিত। সেখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে পর, মুখরক দেখিল—পরমলাবণ্যবতী এক কন্যা জলাশয়ের দিকে আসিতেছে। কন্যা নিকটে আসিলে পর তাহাকে দেখিয়াই, সে মহা বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"একি, পদ্মীষ্ঠা? সত্যই কি তুমি আমার সেই নিরুদ্দেশ বোন পদ্মীষ্ঠা আসিয়াছ?" ততক্ষণে মুখরককে চিনিতে পারিয়া, পদ্মীষ্ঠাও 'দাদা, দাদা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে মাথা লুকাইল! এতদিন পরে ভাই ভগিনীর মিলনে তাহাদের সুখের সীমা রহিল না।

তারপর মুখরক পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মীষ্ঠা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দাদা! আমাকে লইয়া বাবা যখন নিরুদ্দেশ হন, তখন তাঁহার নিকট অনেক টাকাকড়ি ছিল। পথে এক বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, একদিন হঠাৎ একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। পিতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষে তাঁহাকে বধ করিয়া দস্যুরা সমস্ত ধন লইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে আমি বনের মধ্যে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, তাই রক্ষা পাই। শেষে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, আজ এখানে আসিয়া হঠাৎ তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি।"

ভ্রাতা ভগ্নীর কথা বার্ত্তা শুনিয়া এবং পদ্মীষ্ঠার আশ্চর্য্যরূপ দেখিয়া, শ্রীদর্শন এতক্ষণ অবাক্ হইয়াছিল! তখন মুখরক তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া

বলিল—"শ্রীদর্শন! আমার বোন গুণবতী ও সুন্দরী—তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইব।" শ্রীদর্শন বলিল—"বন্ধু! তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আমি ও পদ্মীষ্ঠাকে ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু, মালবে গিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে পর, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীদর্শন, মুখরক ও পদ্মীষ্ঠা যাত্রা করিল। যথাসময়ে তাহারা মালবে রাজা সুসেনের রাজধানীতে পৌঁছিলে পর, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়ীতে তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। কথায় বার্ত্তায় সকলের পরিচয় দিয়া, ব্রাহ্মণীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমার নাম, যশঃস্বতী। আমার স্বামী সত্যব্রত এই দেশের রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি নিতান্ত নিঃসহায় হইলাম দেখিয়া, রাজা দয়া করিয়া মাসে মাসে আমাকে কিছু কিছু দেন এবং তাহা দিয়াই আমি সংসার চালাই। কিন্তু দুঃখ এই—এমন যে দয়ালু রাজা, তিনি এখন কঠিন যক্ষারোগে ভুগিতেছেন। হাকিম, কবিরাজ সকলেই হার মানিয়াছে, কেহ তাঁহাকে আরাম করিতে পারে নাই। তারপর এখন একজন যাদুকর রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছে, 'মহারাজ! আমি বেতাল সাধনার মাত্র জানি। উপযুক্ত সাহসী লোকের সাহায্য পাইলে, সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, বেতালের সাহায্যে আমি আপনাকে ভাল করিতে পারি।''

'ইহা শুনিয়া রাজা সহরময় ঢোল পিটাইলেন কিন্তু তেমন লোক পাওয়া গেল না। তখন তিনি মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—'যাহারা জুয়া খেলে তাহারা বড় সাহসী হয়। আমার আশ্রমে খুঁজিয়া দেখ, তেমন সাহসী লোক পাও কিনা।' শুনিলাম, রাজার আদেশে মন্ত্রী নাকি আশ্রমে সাহসী লোকের সন্ধান করিতেছেন।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণী শ্রীদর্শনকে বলিলেন—"বাছা! তোমাকে দেখিলেই মনে হয়, তুমি বড় তেজস্বী। আর তোমার যদি তেমন সাহসও থাকে, তবে চল, তোমাকে রাজার নিকট লইয়া যাই।"

শ্রীদর্শন ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীদর্শনের চেহারার মধ্যে এমনই একটা তেজ ও বীরত্বের ভাব ছিল যে, তাহাকে দেখিবামাত্র রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার যন্ত্রণা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

তখন রাজা য ডুকর সন্ন্যাসীকে ডাকাইলেন এবং শ্রীদর্শনকে দেখাইয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! এই ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য করিবে। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আমাকে আরোগ্য কর।" তখন সন্ন্যাসী শ্রীদর্শনকে বলিলেন—"আজই রাত্রে তুমি শ্মশানে আমার নিকট যাইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে শ্রীদর্শন একখানি তলোয়ার লইয়া, একাকী শ্মশানে গেল। অমাবস্যার রাত্রি, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! চারিদিকে ভূত, প্রেত, বেতাল, ডাকিনী, যোগিনী নাচিয়া বেড়াইতেছে—স্থানে স্থানে চিতার আগুনে একটু আলোও হইয়াছে। সাহসী শ্রীদর্শন একটুও ভয় পাইল না, চারিদিকে সন্ধান করিয়া দেখিল—শ্মশানের ঠিক মধ্যখানে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন—শরীরে ভস্মমাখা, মাথায় শবের কাপড়ের পাগ্‌ড়ি, পরনে কালরঙ্গের ধুতি! তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রীদর্শন বলিল—"ঠাকুর! আমি আসিয়াছি। এখন কি করিতে হইবে, বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"এক ক্রোশ পশ্চিমে গেলে একটা অশোক গাছ দেখিতে পাইবে। সেই গাছের তলায় একটা শব আছে, সেই শবটাকে এখানে লইয়া আইস।"

সন্ন্যাসীর উপদেশ মত শ্রীদর্শন অশোক তলায় গিয়া দেখিল, সেই শবটাকে অন্য এক ব্যক্তি লইয়া যাইতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া শবের পা ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিল—"এটা আমার "বন্ধুর শব। শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, এটাকে আমি পোড়াইব।" অন্য ব্যক্তি বলিল—"বটে! এটা আমার বন্ধুর শব, কিছুতেই আমি ছাড়িব না।" দুই জনের এই টানাটানির সময়, হঠাৎ এক বেতাল আসিয়া ঐ শবের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! আর তখনই শবটা জাবন্ত হইয়া বিকট এক চীৎকার!! চীৎকার শুনিবামাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল! কিন্তু শ্রীদর্শনের কিছুই হইল না, সে সেই শব কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল!

এ দিকে দ্বিতীয় ব্যক্তির মৃতদেহে অন্য এক বেতাল আসিয়া প্রবেশ করায়, সেই শবও জীবিত হইয়া শ্রীদর্শনকে ডাকিয়া বলিল—"শীঘ্র থাম, আমার বন্ধুর শব লইয়া যাইও না।" শ্রীদর্শন বুঝিতে পারিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মৃতদেহে বেতাল ঢুকিয়াছে। তখন সে বলিল—"এই শব আমার বন্ধু, তুমি যে তোমার বন্ধু বলিতেছ

তাহার প্রমাণ কি?" দ্বিতীয় ব্যক্তির শব বলিল—"তোমার কাঁধের শবকেই জিজ্ঞাসা কর, সে ই প্রমাণ বলিয়া দিবে।" শ্রীদর্শন বলিল—"আচ্ছা, তবে আমার কাঁধের শবই বলুক—সে কাহার বন্ধু।"

এ কথায় শ্রীদর্শনের কাঁধের শব বলিল—"আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে; যে আমাকে খাদ্য দিতে পারিবে, আমি তাহারই বন্ধু।" তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির শব বলিল—"আমার কাছে কোন খাদ্য নাই, যাহার পিঠে আছ সেই তোমাকে খাদ্য দিক্।" এই কথা শুনিয়া শ্রীদর্শন বলিল—"আচ্ছা, আমিই খাদ্য দিব।" এই বলিয়া, তলোয়ার দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির শব কাটিতে উদ্যত হইল, সেই শব হঠাৎ অদৃশ্য হইল!

তখন শ্রীদর্শনের কাঁধের শব তাহাকে বলিল—"এখন তোমার কথামত আমাকে খাদ্য দাও।" শ্রীদর্শন তলোয়ার দ্বারা নিজেরই মাংস কাটিয়া কাঁধের শবকে খাইতে দিল। তখন শবাবিষ্ট বেতাল বলিল—"ওহে বীরপুরুষ! তোমার সাহস দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—তোমার কাটা শরীর পূর্ণ ও সুস্থ হউক। এখন আমাকে তুমি লইয়া যাও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু ঐ হতভাগা কাপুরুষ সন্ন্যাসীকে আমি বধ করিব।"

শ্রীদর্শন সুস্থ শরীরে পিঠে শব লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিলেন। তারপর মানুষের হাড়ের চূর্ণ দ্বারা মাটিতে একটা গোল দাগ কাটিয়া, তাহার মধ্যে শবটাকে চিৎপাত করিয়া রাখিলেন। তারপর মানুষের চর্ব্বির বাতি জ্বালিয়া, ক্ষণকাল মন্ত্র পড়িয়া সেই শবের বুকে চড়িয়া বসিলেন। বসিয়া, মানুষের হাড়ের চামচে ঘি লইয়া শবের মুখে অর্ঘ্য দিতে উদ্যত হইলে, সেই শবের মুখ হইতে এমনই ভীষণ আগুনের শিখা বাহির হইতে লাগিল যে, উহা দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্! তৎক্ষণাৎ সেই শবের বেতাল বাহির হইয়া, সন্ন্যাসীকে তাড়া করিয়া ধরিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গিলিয়া ফেলিল!

এই ব্যাপার দেখিয়া শ্রীদর্শন তলোয়ার হস্তে বেতালকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, বেতাল বলিল—"শ্রীদর্শন! ক্ষান্ত হও।" তারপর শ্রীদর্শনের হাতে

এক মুঠা সরিষা দিয়া পুনরায় বলিল—"এই সরিষা রাজার হাতে ও মাথায় রাখিলেই তিনি ভাল হইবেন। আর তুমিও অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর রাজা হইবে।" শ্রীদর্শন বলিল—"কিন্তু রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্ন্যাসী কোথায় ? তখন কি বলিব ? তিনি যে মনে করিবেন, আমি আমার স্বার্থের জন্য সন্ন্যাসীকে বধ করিয়াছি।" বেতাল বলিল—"তখন রাজাকে সব কথা বলিয়া, তলোয়'র দিয়া এই শবের পেট কাটিলেই দেখিবে, তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ আছে এবং তাহা হইলে রাজাও তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন।" এই বলিয়া বেতাল শূন্যে মিলাইয়া গেল।

বেতাল চলিয়া গেলে, সরিষাগুলি লইয়া শ্রীদর্শন রাজার নিকট গিয়া সব ঘটনা বর্ণন করিল। শুনিয়া রাজা অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তখন তাঁহার আদেশে মন্ত্রী শ্রীদর্শনের সহিত ঘটনাস্থলে গেলে পর, শ্রীদর্শন তলোয়ার দিয়া সেই শবের পেট কাটিবামাত্র, মন্ত্রী দেখিলেন—সত্য সত্যই তাহার ভিতর সন্ন্যাসীর মৃতদেহ রহিয়াছে। মন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এই সংবাদ জানাইলে, তিনিও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পর শ্রীদর্শন রাজার হাতে ও মাথায় সেই সরিষা রাখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরাম করিল।

রাজার পুত্রসন্তান ছিল না। এই দারুণ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, শ্রীদর্শনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, মহা সমারোহে তাঁহাকে যুবরাজ করিলেন। যুবরাজ হইবার কিছুদিন পরেই পদ্মিষ্ঠার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

এই সময়ে একদিন উপেন্দ্রশক্তি নামে মালবের এক বণিক, বহুমূল্য পাথরের প্রস্তুত একটি গণেশের মূর্ত্তি যুবরাজকে উপহার দিল। যুবরাজ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, প্রতিদিন তাঁহার আদেশে মহা ধুমধামের সহিত গণেশের পূজা হইত। ইহাতে গণেশ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রাত্রিতে তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন—"শ্রীদর্শন আমার পরম ভক্ত, তাহাকে আমি পৃথিবীর রাজা করিব। এখন তোমাদিগকে একটা কাজ করিতে হইবে—পশ্চিম সমুদ্রে একটি দ্বীপ আছে, তাহার নাম 'হংসদ্বীপ', সেই দ্বীপের রাজা অনঙ্গোদয়ের

অপরূপ সুন্দরী এক কন্যা আছে—অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরীও আমার পরমভক্ত। সে প্রতিদিন আমার পূজা করিয়া প্রার্থনা করে—'প্রভু! কৃপা করিয়া আমাকে এমন স্বামী দিন্ যিনি পৃথিবীর সম্রাট্ হইবেন।' সুতরাং আমার ইচ্ছা, শ্রীদর্শনের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়া দুইজনাকেই পুরস্কৃত করিব। অতএব শ্রীদর্শনকে তোমরা হংসদ্বীপে লইয়া যাও এবং উভয়কে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পুনরায় তাহাকে এখানে লইয়া আইস। পরে সময় মত ইহাদের বিবাহ হইবে।

গণেশের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ, সেই রাত্রেই ঘুমন্ত শ্রীদর্শনকে হংসদ্বীপে লইয়া গিয়া, অনঙ্গমঞ্জরীর ঘরে রাখিয়া দিল। ক্ষণকাল পরে শ্রীদর্শন জাগিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন! ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এ কোথায় আসিলাম? এই কন্যাই বা কে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? যাহা হউক, কন্যাকে জাগাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি।" এই ভাবিয়া যুবরাজ কন্যার ঘুম ভাঙ্গাইলে, কন্যাও অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"ইনি কি কোন দেবতা, আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন? এমন রূপত মানবের হয় না! কি করিয়া আমার অন্তঃপুরে আসিলেন?" এই ভাবিয়া সে যুবরাজের পরিচয় লইল এবং তাঁহার অনুরোধে নিজেরও পরিচয় দিল। তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, পরস্পর আংটি বদল করিলেন। পরে শ্রীদর্শন যেই ইচ্ছা করিলেন যে, রাজকুমারীকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিবেন, অমনি গণেশের অনুচরগণ মায়া দ্বারা তাঁহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া, শ্রীদর্শনকে পুনরায় মালবে আনিয়া তাঁহার ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীদর্শন জাগিয়া দেখিলেন তিনি তাঁহার ঘরেই শুইয়া আছেন। তখন নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হংসদ্বীপের রাজকুমারীর নিকট ছিলাম আর এখন আবার আমার ঘরে আসিলাম কি করিয়া? এই যে রাজকুমারীর আংটিও আমার আঙ্গুলে রহিয়াছে—সুতরাং এ ত স্বপ্নও নয়? নিশ্চয় তবে ইহা কোন দেবতার মায়া!" যুবরাজ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় পদ্মীষ্ঠাও জাগিলেন, এবং স্বামীর নিকট সব ঘটনা শুনিয়া, তাঁহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীদর্শন রাজা সুসেনের নিকট রাত্রের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রাজা খুবই আশ্চর্য্য হইলেন এবং দেখিলেন, শ্রীদর্শনের হাতে সত্যই অনঙ্গমঞ্জরীর আংটি রহিয়াছে। তখন ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যে হংসদ্বীপের সংবাদ বলিতে পারিবে তাহাকে অনেক পুরস্কার দিব।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না। শ্রীদর্শন ক্রমে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন; আহার নিদ্রা ছাড়িয়া রাতদিন কেবলই বিষণ্ণ মনে বসিয়া থাকেন, কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না।

এ দিকে হংসদ্বীপে অনঙ্গমঞ্জরীরও সেই দশা। জাগিয়া উঠিয়াই দেখিলেন, হাতে যুবরাজের নাম লেখা আংটি রহিয়াছে কিন্তু যুবরাজ নাই! ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন। এই সময়ে দৈবাৎ রাজা আসিয়া তাঁহার ঘরে উপস্থিত। তিনি কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহাকে বিষণ্ণ ও লজ্জিত দেখিয়া এবং পরক্ষণেই তাঁহার আঙ্গুলে পুরুষের আংটি দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তোমার মুখ কেন মলিন? এ কাহার আংটি পরিয়াছ আর এত লজ্জাই বা কিসের জন্য?" পিতার মিষ্ট কথায় ভরসা পাইয়া, অনঙ্গমঞ্জরী তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া, রাত্রের সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এ সমস্তই দৈব-ঘটনা। কিন্তু তিনি অনেক ভাবিয়াও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মসোম নামে একজন সর্ব্বজ্ঞ ঋষি রাজাকে বড় স্নেহ করিতেন। এই মুনির নিকট গিয়া, তাঁহাকে সব কথা বলিয়া রাজা তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিঠাকুর যোগবলে সব কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"মহারাজ! গণেশের অনুচরগণ মালবের যুবরাজ শ্রীদর্শনকে রাত্রে অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট আনিয়াছিল। শ্রীদর্শন ও অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতি গণেশ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছেন আর গণেশের কৃপায় শ্রীদর্শন পৃথিবীর রাজা হইবে। সুতরাং মালবের যুবরাজ যে রাজকুমারীর অতি উপযুক্ত পাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" মহর্ষির কথা শুনিয়া রাজা অনঙ্গোদয় বলিলেন—"মালবরাজ্য বহুদূরে, পথঘাটও অতিশয় দুর্গম অথচ বিবাহ শীঘ্রই হওয়া উচিত। সুতরাং এই কঠিন ব্যাপারে আমি আপনার দয়ার উপরই নির্ভর করিলাম।"

মহর্ষি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমিই এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ঋষি যোগবলে তখনই অন্তর্দ্ধান হইয়া নিমেষমধ্যে মালবদেশে রাজা সুসেনের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত! সেখানে শ্রীদর্শন নির্ম্মিত মন্দিরে ভক্তির সহিত গণেশের পূজা করিতে লাগিলেন। মুনিঠাকুর যখন পূজায় মগ্ন, তখন বণিক উপেন্দ্রশক্তির ঘোর উন্মাদ পুত্র মহেন্দ্রশক্তি, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘটনাক্রমে সেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। মুনিঠাকুরকে দেখিয়াই পাগল মহেন্দ্রশক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হঠাৎ এরূপভাবে পাগল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, মহর্ষি পাগলের গালে প্রচণ্ড এক চড় মারিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চড় খাইয়াই তাহার পাগলামী আর নাই, সে স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করিল। পাগল ছিল উলঙ্গ, সুতরাং তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসামাত্র, সে লজ্জায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে বাড়ী গিয়া উপস্থিত।

বাড়ীতে গিয়া সভ্য হইয়া সে যখন পিতাকে সব কথা বলিল, তখন তাঁহার আহ্লাদের সামা রহিল না! তিনি পুত্রের সহিত তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গিয়া মুনিঠাকুরের পায়ে পড়িলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া নানাপ্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ক্রমে এই অদ্ভুত বার্ত্তা রাজা সুসেনের কাণে পৌঁছিলে, তিনি শ্রীদর্শনের সহিত মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঋষির পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—"প্রভু! আপনার অনুগ্রহে বণিকপুত্রের পাগলামী দূর হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া আমারও একটু উপকার করুন—আমার পুত্র এই শ্রীদর্শনের মঙ্গল করুন।" এ কথায় মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ! তোমার পুত্র রাত্রিতে হংসদ্বীপে গিয়া রাজকুমারী অনঙ্গমঞ্জরীর মনটি ও তাহার আংটি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সুতরাং এই চোরের উপকার কেন করিব? যাহা হউক, তুমি যখন রাজা, তখন তোমার আদেশ পালন করিতেই পারি।" এই বলিয়া মুনিঠাকুর শ্রীদর্শনের হাত ধরিয়া যোগবলে তাহার সহিত অদৃশ্য হইলেন।

যথা সময়ে হংসদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি ব্রহ্মসোম শ্রীদর্শনকে রাজা অনঙ্গোদয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজবাড়ীতে বিবাহের ধুম পড়িয়া

গেল এবং উত্তম লগ্নে অনঙ্গোদয় শ্রীদর্শনের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর মুনিঠাকুরের কৃপায় শ্রীদর্শন পত্নীর সহিত মালবে ফিরিয়া আসিয়া, দুই স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী ও পদ্মীষ্ঠার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে রাজা সুসেনের মৃত্যু হইলে শ্রীদর্শন সিংহাসনে বসিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বশ হইল। কিছুকাল পরে পদ্মীষ্ঠা ও অনঙ্গমঞ্জরীর এক এক পুত্র জন্মিল, শ্রীদর্শন তাহাদের নাম রাখিলেন—পদ্মসেন আর অনঙ্গসেন।

ইহার পর একদিন শ্রীদর্শন দুই পত্নীর সহিত অন্তঃপুরে বসিয়াছিলেন, এমন সময় বাহিরে কাহার কান্না শুনিতে পাওয়া গেল। তাহাকে ডাকিবার জন্য শ্রীদর্শন একজনকে পাঠাইলেন! ক্ষণকাল পরে ভৃত্য এক ব্রাহ্মণকে আনিয়া উপস্থিত করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ! যক্ষ অট্টহাস জ্যোতির্লেখা ও ধূমলেখার সহিত দীপ্তশিখাকে বিনাশ করিয়াছে!"—এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আর ইহা শুনিবামাত্রই দুই রাণীর মৃত্যু হইল!

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া শ্রীদর্শন একেবারে অবাক্! তাঁহার কি যে দারুণ কষ্ট হইল তাহা আর কি বলিব! ক্রমে তাঁহার মন এতই অস্থির হইল যে, দুই রাজকুমারকে রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া, তপস্যার জন্য তিনি বনে চলিয়া গেলেন।

বনে গিয়া শ্রীদর্শন ফল মূল খান আর তপস্যা করেন। এইরূপে দিন যায়, একদিন এদিক্ সেদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন—সমুখে প্রকাণ্ড বড় একটা বটগাছ। গাছের নিকট যাইবামাত্র, তাহার কোটর হইতে হঠাৎ দুইটি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের হাতে সুমিষ্ট ফল আর তাঁহারা কি অপরূপ সুন্দরী—যেন দেবকন্যা! শ্রীদর্শনের নিকট আসিয়া তাঁহারা বলিলেন—"মহারাজ! আপনার জন্য এই ফল আনিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আহার করুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে?" স্ত্রীলোকদুটি বলিলেন—"আমাদের বাড়ীতে চলুন, সেখানে গিয়া সব কথা বলিব।"

শ্রীদর্শন তাঁহাদিগের সহিত গাছের কোটরে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেখানে অতি আশ্চর্য্য এক সোণার পুরী! যাহা হউক, ফলমূল খাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে পর, রমণী দুইটি বলিলেন—"মহারাজ! একটা গল্প বলিতেছি, শুনুন—

বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানপুরে "কমলগর্ভ" নামে পরম সাধু এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল—পদ্মা আর অবলা। অনেক দিন পরমসুখে বাস করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারা তিন জনে একত্র আগুনে প্রবেশ করিলেন। এবং সেই সময়ে করযোড়ে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জন্মে জন্মে এইরূপ স্বামীস্ত্রী হইয়া বাস করিতে পারি।" ইহার পর কমলগর্ভ তাঁহার সাধনার বলে, যক্ষকুলে দীপ্তশিখা নামে যক্ষ অট্টহাসের ছোট ভাই হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁহার স্ত্রী—পদ্মা ও অবলা জ্যোতির্লেখা ও ধূমলেখা নামে যক্ষরাজ ধূমকেতুর কন্যা হইয়া জন্ম নেন!

ক্রমে দুটি বোন বড় হইয়া, উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য বনে গিয়া মহাদেবের তপস্যা করিলে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন—"যে স্বামীর

সহিত তোমরা পূর্ব্ব জন্মে আগুনে প্রবেশ করিয়াছিলে এবং জন্মে জন্মে যাহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই ব্যক্তি যক্ষকুলে দীপ্তশিখা নামে জন্মিয়াছিল পরে আবার তাহার প্রভুর শাপে সে শ্রীদর্শন নামে পৃথিবীতে জন্মিয়াছে! অতএব তোমরা দুইজন পৃথিবীতে জন্ম লইয়া শ্রীদর্শনের স্ত্রী হও। তারপর শ্রীদর্শনের শাপ দূর হইলে, তোমরা তিন জনই আবার যক্ষ হইবে।"

মহাদেবের এই কথার পর যক্ষ বোন দুটি পৃথিবীতে পদ্মৌষ্ঠা ও অনঙ্গমঞ্জরী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীদর্শনের স্ত্রী হইয়াছিল। কিছুকাল পর, একদিন, যক্ষ অট্টহাস ব্রাহ্মণের বেশে তাহাদিগের নিকটে আসিয়া, কৌশলক্রমে, পদ্মৌষ্ঠা ও অনঙ্গমঞ্জরীর মনে তাহাদের পূর্ব্বজন্মের কথা জাগাইয়া দেওয়াতে, তাহারা দেহত্যাগ করিয়া যক্ষিনী হইয়াছে। মহারাজ! আমরাই তোমার সেই দুই স্ত্রী পদ্মৌষ্ঠা ও অনঙ্গমঞ্জরী। আর তুমি যক্ষ অট্টহাসের ভাই দীপ্তশিখা।"

এই কথা শুনিবামাত্র, শ্রীদর্শনের পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ যক্ষ দীপ্তশিখার রূপ ধারণ করিয়া, তিনি তাঁহার যক্ষিনী স্ত্রীদুটির সহিত মিলিত হইলেন।

গান

তোমার স্নেহের কোলে রেখেছ সবারে,
আনন্দে অভয়ে প্রভু রেখেছ সবারে।
তুমি আছ সাথে সাথে নাহি কোন ভয়,
করুণা-নিধান তুমি, মঙ্গল আলয়,
জননী জননী তুমি পরমেশ দয়াময়।

তোমার নয়নতলে আছে এ জীবন,
তোমার আশীষ আছে ঘিরে অনুক্ষণ।
এত ভালবাসে কেবা, এত দয়া কার,
তোমার চরণে নমি, নমি বারে বার,
তোমার চরণে নমি, নমি বারে বার।

গান ও স্বরলিপি—শ্রীমতী সুখলতা রাও

মিশ্র—দাদ্‌রা।
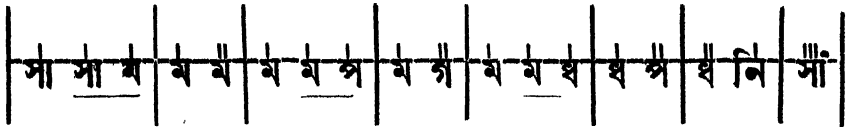
| সা সা ম | ম ম | ম ম প | ম গ | ম ম ধ | ধ প | ধ নি | সাঁ |

১। তো মা — র স্নে হে র — কো লে রে খে — ছ স বা — রে
২। তো মা — র ন য় ন — ত লে আ ছে — এ জী ব — ন্

| সা সা নি | সা সা ঋসা | নি ধ | প ম | গ গ | ম ম প | গ ঋ | সাঁ ||

আ ন — ন্দে অ — ভ য়ে প্র ভু রে খে ছ স — বা — রে
তো মা — র আ — শী ষ আ ছে ঘি রে অ নু — ক্ষ — ণ্
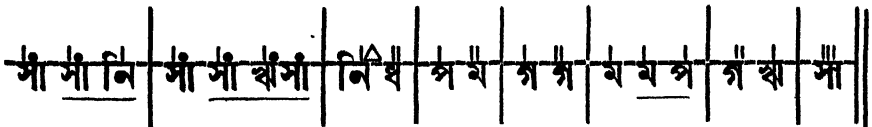
ম ম | ধ ধ | নি নি | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্ঋ | র্ঋ র্সা র্ঋ র্সা | নি | র্সা |

তু মি আ ছ সা থে সা থে না হি — কো ন — ভ য়্

এ ত ভা ল বা সে কে বা এ ত — দ য়া — কা র্

র্সা র্সা র্গ | র্গ র্গ | র্ম র্গ | র্ঋ র্সা | নি ধ | ধ ধ | নি | র্সা | র্সা র্সা নি |

ক রু — ণা নি ধা ন তু মি ম ঙ্গ ল আ ল য়্ জ ন —

তো মা — র চ র ণে ন মি, *ন মি বা রে বা র্ তো মা —

র্সা র্সা র্ঋ র্সা | নি ধ | প ম | গ গ | ম ম প | গ ঋ | সা ||

না জ — ন না তু মি প র মে শ — দ য়া ময়্

র চ — র ণে ন মি ন মি বা রে — বা — র্

* ('নমি বারে'র সুর 'মঙ্গল আ'র মত না হইয়া '| নি ধ | ধ ধ |' হইবে।
ন মি বা রে

উপহার

[শ্রীবিশ্বনাথ রায় এম-এ]

সেদিন সকালে নরেশ হঠাৎ এসে যতীনকে বল্‌ল, "আরে, জেলখানার মাঠে এক সার্কাস এসেছে তাতে অনেক বাঘ, সিংহ, ঘোড়া সব আছে চল্‌না দেখে আসি, কেবল বই নিয়ে পড়া!" যতীন বল্‌ল, "না এখন যেতে পারব না, পড়া না কর্‌লে বাবা মার্‌বেন, আমি বৈকালে যাব।" নরেশ যতীনের আরো কাছে মুখ নিয়ে এসে অনুচ্চস্বরে বল্‌লে—যাতে পাশের ঘর হ'তে যতীনের বাবা শুনতে না পায়—"হাঁ, মার্‌লেই হ'ল, তুই ভয় করিস্ কিনা তাই, আমাকে যদি বাবা ম'র্‌তে আসে আমি এমনি চেঁচিয়ে শুয়ে পড়ি যে আর বাবা মার্‌তেই সাহস করে না, তুই যেমন বোকা।" এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে যতীনের বাবা বলে উঠলেন, "যতীন, পড়্‌ছিস্ নে কেন? জোরে জোরে পড়।" যতীন আরম্ভ কর্‌ল, "Thou busy, busy bee." নরেশও একটু আড়ষ্ট হয়ে পাশে দাঁড়াল—তার মুখে তখন কথা নেই। এম্নিভাবে খানিকক্ষণ থাকার পর বল্‌লে, "আয়না পালিয়ে, দেখ্‌তে ত পাচ্ছে না একটু পরেই ফিরে আস্‌ব, তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বি পায়খানায় গিয়েছিলাম।"

"না ভাই, মিথ্যাকথা বল্‌তে সকলে বারণ করেছে আর বাবা যদি জান্‌তে পারেন যে মিথ্যা কথা বলেছি তা হ'লে খুন করে ফেল্‌বেন। তা হবে না, আর ওবেলা গেলেও ত দেখ্‌তে পাব, এখন থাক্।"

"তবে থাক্ তুই পড়া নিয়ে গাধা কোথাকার।" নরেশ চলে গেল। যতীনের মন তখন সার্কাসের বাঘ সিংহ সব দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে, মুখে পড়া বল্‌ছিল বটে কিন্তু মন ছিল তার জেলখানার মাঠে বাঘ সিংহের ওপর, আর নরেশ সে সব দেখে কেমন আনন্দ করছে তার ওপর। যতীন কোন রকমে পড়া শেষ করে উঠল।

* * * *

বৈকালে যতীন যখন নরেশ, বীরেন, মহি প্রভৃতি সকলের সঙ্গে খেল্‌তে গেল, তখন কেউ তার সঙ্গে খেল্‌তে চাইল না—নরেশ এর মধ্যে সকলকে ঠিক করে রেখেছে যেন কেউ তার সঙ্গে খেলা না করে, কারণ তাকে যখন সকালে ডাকা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে মাঠে সার্কাসের বাঘ, সিংহ দেখ্‌তে যায় নি সেটা তার আইনে খুব গুরু অপরাধ আর তার শাস্তিও অনিবার্য্য। নরেশের এই শাস্তিবিধান সকলেই পালন করতে বাধ্য—যখন সেই হ'চ্ছে সে দলের পাণ্ডা। সুতরাং কেউ যখন খেল্‌তে চাইল না তখন যতীনের ভারী রাগ হ'ল—সে বল্‌ল "দেখি কেমন করে আমাকে খেল্‌তে না নাও, আমি খেলবই; তারপর সে জোর করে খেলায় মিশ্‌তে যাওয়ার ফলে নরেশের সঙ্গে বেশ একটু মারামারি বেধে গেল। এমন সময়ে যতীনের বাবা সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। যতীনের সঙ্গে মারামারি হ'চ্ছে দেখে যতীনকে টেনে এনে দুই চড় মেরে বল্‌লেন, "বলেছি গাধাদের সঙ্গে মিশিস্‌নে, তা কথা কানেই যায় না। যা বাড়ী যা।" যতীন ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। যতীনের এই অবস্থা দেখে তার প্রতি সমবেদনায় সকলের মনে বেশ একটু কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল এবং খেলাও সেদিনের মত ভেঙ্গে গেল।

পরদিন বৈকালে যখন খেলা কর্‌বার জন্য সকলে একসঙ্গে মিলিত হ'ল তখন যতীনের অভাবটা সকলেই বেশ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। যতীনকে সে দলের সবাই ভালবাস্‌ত কারণ তার ভালছেলে বলে একটু নাম ছিল। সে দলের মধ্যে নরেশই যতীনকে সবার চাইতে ভালবাসত, তার প্রাণের মধ্যে খুব কষ্ট হলেও মুখে কিছু প্রকাশ কর্‌তে পারে নি। তার দোষ বলে যখন সকলেই তাকে অনুযোগ কর্‌তে আরম্ভ করলো তখন তার কষ্ট চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময়ে দূরে যতীনকে আস্‌তে দেখে সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ঐযে যতীন আস্‌ছে" নরেশ সেইদিকে তাকিয়ে যতীনকে আস্‌তে দেখে তার কাছে ছুটে গেল। তার হাত ধরে তাকে দলের দিকে আন্‌তে আন্‌তে বল্‌ল, "তুই নিজেই ত জোর করে খেল্‌তে গিয়ে মারামারি বাধালি আর বাবার কাছে মার খেলি।"

"তুই কেন আমাকে খেলতে নিবিনে বললি, আমার বুঝি রাগ হয় না।" এম্নি আরো দু'চারটে কথা হওয়ার পর তাদের সমস্ত মিটমাট হয়ে গেল। আর

নরেশও সেদিন যতীনের কথামত খেলা আরম্ভ করে দিল। যতীনই হ'ল সেদিন দলের নেতা। তাদের খেলা আবার বেশ জমে উঠ্‌ল—যেন কোন কিছুই হয়নি।

* * * *

এম্নিভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর এক সময়ে পাড়ায় নরেশের বদ্‌নাম হ'তে লাগ্‌ল। সে বখাটে, ডেঁপো, একেবারে বয়ে গিয়েছে বলে বেশ একটু অখ্যাতি রট্‌তে আরম্ভ করলো। তখন একদিন যতীনের বাবা নরেশের সঙ্গে যতীনকে মিশ্‌তে বারণ করে দিলেন। যতীন মাথা নীচু করে থাক্‌ল—কোন আপত্তি কর্‌তে পার্‌ল না। সেই থেকে যতীন নরেশকে এড়িয়ে এড়িয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল বটে কিন্তু তার প্রাণ যেন তাতে সায় দিতে পার্‌ল না—ক্রমে ক্রমে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। পূর্ব্বে দু একদিন নরেশের সঙ্গে দেখা না হ'লেও তার বিশেষ কিছু মনে হত না কিন্তু এখন তার একদিন দেখা না পেলেই যতীনের মনটা ব্যাথায় ভরে উঠে। নিরিবিলিতে দুজনের দেখা হলেই দু'চারটে কথা হয় আবার যতীনের পিতার নিষেধের কথা মনে হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। যতীনের এই রকম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নরেশ একদিন বল্‌লে, "ভাই কিছুদিন থেকে দেখ্‌ছি তুই যেন আমার সঙ্গে আর তেমন ভাবে মিশ্‌তে চাস্‌নে, হঠাৎ দেখা হলে দু'চারটে কথা বলে সেখান থেকে চলে যাস্‌; ভাই কি দোষ করেছি যে তুইও সবার মত আমায় ছেড়ে যাচ্ছিস, সবার সঙ্গে আর তোর সঙ্গে ত একরকম ভালবাসা নয়। সবাই যদি ছেড়ে যায় তবু আমি কোন ভয় করিনে যদি কেবল তুই না ছাড়িস।"

যতীন উত্তর দিল, "তোকে ছাড়তে শুধু কি তোর কষ্ট হচ্ছে আর আমার কিছু হচ্ছে না?"

"তবে কেন ভাই ছেড়ে যাবি?"

"কি করব নিরুপায় হয়ে ছাড়্‌তে হ'চ্ছে। বাবা তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন। তুই পড়াশুনা করিসনে, কেবল বখামি করে বেড়াস্‌, এতে নিজে নষ্ট হবি আর সকলকেও নষ্ট কর্‌বি। তাই তিনি বারণ করেছেন। ভাই তুই

পড়াশুনা কর্, আমি জানি তুই ভাল হবি; তখন বাবা নিশ্চয়ই মিশ্‌তে বারণ করবেন না।" নরেশ হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গিয়ে চুপ্ করে থাক্‌লো। যতীন আবার বল্‌ল "বল ভাই পড়াশুনা কর্‌বি।"

"চেষ্টা করে দেখ্‌ব যদি পারি।"

"তুই নিশ্চয়ই পার্‌বি; আমার খুব বিশ্বাস আছে যে তুই নিশ্চয়ই ভাল ছেলে হ'বি।

নরেশ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে চলে গেল। সে বখাটে, পড়াশুনা করে না বলে যতীনকেও আজ নিরুপায় হয়ে তাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যাদের কিছুক্ষণ দেখা না হ'লে দুজনেই অস্থির হ'য়ে পড়ত আজ তাদেরই মধ্যে একটা আড়াল গড়ে উঠ্‌ছে। এ আড়াল তাকে ভাঙ্গতেই হ'বে। সে পড়াশুনা করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'ল।

তারপর হ'তে নরেশ ইচ্ছা করেই কারো সঙ্গে দেখা কর্‌ত না। সকলে যেমন তার বিরুদ্ধে একসঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে সেও তেম্‌নি একা সকলের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। পাড়ার সব ছেলে যে স্কুলে পড়ত সেখানে গেলে সকলের সঙ্গে রোজ দেখা হ'বে এই আশঙ্কায় নরেশ সেখানে না গিয়ে দূরে অন্য একটী স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। সেখানে সে নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় আবার বাড়ী এসে পড়্‌তে আরম্ভ করে—বাড়ী এসে বড় একটা বের হয় না। যতীন কয়েকদিন নরেশের দেখা না পেয়ে তার বাড়ীর কাছে এসে ঘুরে গেল। এম্নি করে কয়েকবার সে ঘুরে গিয়েছে—কিন্তু ডাক্‌তেও পারেনি অথচ দেখা না হওয়ায় প্রাণে একটা আকুল অশান্তি নিয়ে ফিরে গিয়েছে। বছর ঘুরে গেল কিন্তু নরেশের সঙ্গে যতীনের দেখা হয়নি। যতীনের মনে খুব অভিমান হ'তে লাগ্‌ল। সে নরেশের সঙ্গে মিশ্‌বে না বলেছিল বটে কিন্তু তা যে এরকমভাবে পালন করা হ'বে তা সে কথনও স্বপ্নেও ভাবেনি। সে না হয় বলেছিলই কিন্তু তাই বলে কি নরেশের হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নেই যে মাঝে মাঝে দেখা কর্‌তেও পারে না। দেখা কর্‌তে তার কি দোষ ছিল? এবার যদি নরেশের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে সে কথা ত বল্‌বেই না এমন কি চোখ তুলে চাইবেও না। তার

প্রতিজ্ঞা তার মনেই থেকে গেল। কথা ত দূরের কথা এমন কি চোখের দেখা পর্য্যন্তও হ'ল না। যত দিন যাচ্ছিল দিনে দিনে এটা যেন ক্রমে তার নিজের অপরাধ বলেই মনে হতে লাগ্‌ল। সে যদি নরেশকে অমন করে প্রাণে আঘাত না দিত তাহলে বোধ হয় এমন কিছু হত না এবং নরেশও তার সঙ্গে দেখা করতো।

এক বছর চলে গিয়েছে। এমনিভাবে নিজের মনের মধ্যে আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে অভিমানের প্রাবল্য যখন শিথিল হয়ে এসেছিল এমনি সময়ে একদিন নরেশ কতকগুছি বই হাতে করে যতীনের কাছে এসে উপস্থিত। যতীন আশ্চর্য্য হয়ে অভিমানের সুরে বল্‌ল "এতদিন বুঝি আর আমার কথা মনে ছিল না।" নরেশ বল্‌ল, কেন থাক্‌বে না ভাই, তুই যে মিশ্‌তে বারণ করেছিলি তাই আসিনি আর না এসে ভালই হয়েছে।"

"কেন ভাল কিসের? মনে এত কষ্ট দিয়ে কি ভাল হয়েছে?"

"ভাই এক বছর তোর কষ্ট হয়েছে স্বীকার করি, আমিও তোর চাইতে কিছু কম কষ্ট করিনি, তবু এই কষ্ট স্বীকার করে যা লাভ করেছি তার তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। এই নে ভাই এই বইগুলো তোর।" যতীন আশ্চর্য্য হয়ে নরেশের মুখের পানে চেয়ে রইল।

"ভাই চেয়ে কি দেখ্‌ছিস্? আমি পড়াশুনা করিনে বলে তুই যেদিন আমার সঙ্গে মিশ্‌তে পার্‌বিনে বলেছিলি সেইদিন আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছিল। সেদিন থেকে আমি পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেছি। এই একবছর কেবল পড়াশুনা করেছি। পড়ে উঠে খেয়ে দেয়ে স্কুলে গিয়েছি আবার স্কুল থেকে এসে পড়েছি। কারও সঙ্গে দেখা করিনি বা খেল্‌তে যাইনি—খেলার ইচ্ছে হলেও নিজের ঘরে বসেই খেলেছি। তার ফলে আমাদের শ্রেণীতে আমি প্রথম হয়ে পুরস্কারস্বরূপ এই বইগুলো পেয়েছি। এ পুরস্কার ভাই আমার প্রাপ্য নয়— এগুলো তোর; কারণ তোর জন্যেই এগুলো আমার কাছে এসেছে। এগুলো তুই নে, যদি না নিস্ বইগুলো ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেব" বলে যতীনের হাতে দিল। যতীন নরেশের কথা শুনে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌ল. খানিকক্ষণ চুপ্ করে থেকে পড়ে বল্‌ল, "বেশ নিলাম, কিন্তু ভাই এগুলো ভালবাসার উপহার

স্বরূপ তোকে দিলাম, তুই যদি না নিস্ আমি বিশেষ দুঃখিত হ'ব।" বইগুলোর ওপরে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকল **উপহার**। নরেশ আনন্দের সঙ্গে বইগুলো নিল।

* * * *

সেই বৎসরই নাম কাটিয়ে নিয়ে নরেশ যতীনের স্কুলে এসে ভর্ত্তি হল।

হরিদ্বার ও লছমনঝোলা

[শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরাণী]

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট

আজ ভোরবেলা আমাদের লছমনঝোলায় যাইবার কথা। পূর্ব্বেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়া আছে ও বারবার ভোঁ ভোঁ করিয়া তাড়া দিতেছে।

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া রওনা হওয়া গেল। কোনখানে দূরে আশে পাশে চারিধারেই পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, কোথাও একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া চলিতেছি। দক্ষিণ পাশ দিয়া বেগবতী খরস্রোতা জাহ্নবী লহরীর পর লহরী তুলিয়া আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছে যেন কোনও বাধা না মানা তাহার প্রকৃতি। যে তাহার গমনে বাধা দিয়া স্নান করিতে নামিতেছে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিতেই যেন সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে; সেইজন্য স্নানার্থিদিগকে অতি সতর্কভাবে 'গঙ্গামায়ীর' শুভ ইচ্ছাকে বাধা দিতে হইতেছে, কেহ কেহ স্রোতে গা ভাসাইয়া খানিকটা যাইয়া সন্তরণ সাহায্যে পারে উঠিতেছে। এই দেশের বালক বা যুবকেরা ২।৩টা ততোধিক লাউএর খোল একত্র বাঁধিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

পথে নানা ছোট বড় গিরিনদীর সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। সেতুগুলি ভালই। দু'একটী নদীর উপর সেতু নাই, নদীর গভীরতা নাই দেখিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী যাইতে কিছু বাধে না।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর বন আরম্ভ হইল। চারিদিকেই নিবিড় অরণ্য, দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী বালিকা গঙ্গা যে আমাদের রাস্তার ধার ছাড়িয়া কোথায় কখন কোন দিক দিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহা এতক্ষণ পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া লক্ষ্য করি নাই। মোটর চালক বলিতেছিল এই সব বন সরকারী, বনে নাকি অত্যন্ত বাঘের ভয় আছে এবং বেলা চারিটার পর কোনও লোককে এই পথ দিয়া চলিতে দেওয়া হয় না এবং ৫টার পর গাড়ী চলাও বন্ধ হয়। দেখিলাম সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বন পাহারা দিতেছে। একবার নাকি একখানি এক্কাগাড়ী হইতে একজন যাত্রীকে বাঘে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ক্রমে হৃষীকেশের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইতে লাগিল ততই মন যেন কি একটা আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল। এইবার আবার চঞ্চলা গঙ্গা আমাদের পাশে পাশে চলিতে লাগিল কিন্তু আমরা পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটিতেছিলাম। এখানে পথ অসমতল, মোটর নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছিল, ঠাণ্ডা জলীয় বাতাস আমাদের মুখে চোখে লাগিয়া যেন শীতল হস্ত বুলাইয়া দিতেছিল। অতি সুন্দর দৃশ্য,

চারিদিকেই অভ্রভেদী হিমালয় মাঝখান দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। এইবার মোটর থামিল। অনেকগুলি বড় বড় গাছ রহিয়াছে, বেশ ছায়া শীতল জায়গাটী। এখানে ছোট একটী একতলা বাড়ী, তাতে দেববিগ্রহ আছেন। পূজারী ঠাকুর আমাদের সেই বাড়ীর দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে যে চৌকী পাতা ছিল তাহাতে বসিতে বলিলেন। হৃষীকেশ হইতে "ঝামপান" আনিবার জন্য লোক গিয়াছিল। সেইজন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। মাথায় জটার কুণ্ডলী পাকান খাম, কাগজ ও পেন্সিল হাতে একটী সাধুর আভির্ভাব হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থটি এই যে, কটকের রাজার ম্যানেজারবাবু প্রতি বৈশাখ মাসে "গঙ্গামায়ীর ভোগে"র নিমিত্ত ৫০৲ টাকা বৎসর বৎসর পাঠাইয়া থাকেন, এবার কেন যে টাকা পাঠান নাই তাই জানিবার জন্য ঠাকুরটী সমুৎসক এবং শীঘ্রই যেন সেটা পাঠাইতে হুকুম হয় এই মর্ম্মে একখানি 'খৎ' লেখার দরকার কিন্তু 'খৎখানা' আংরেজী'তে লিখিতে হইবে, কেউ কাছের "আংরেজী" না জানায় সেটী লেখার সুবিধা হইয়া উঠে নাই অতএব দয়া করিয়া চিঠিখানা লিখিয়া দিতে হইবে। যাহা হউক সাধুটীর চিঠিখানি লিখিয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে 'ঝামপান' আসিয়া পৌছিয়াছিল। ঝামপানে চড়িয়া লছমনঝোলার পথে অগ্রসর হওয়া গেল। চড়াইএর পথে উঠিতেছিলাম, পাশে গভীর খাদ, খাদের পাদদেশ চুম্বন করিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। এই স্থানের গঙ্গা যেন একটু স্থির, অত যেন নাচিয়া ছুটিয়া চলিতেছে না, তবে এক এক জায়গায় প্রস্তরে বাধা পাইয়া দ্বিগুণবেগে ফুলিয়া উঠিয়া যেন হাততালি দিয়া শত সহস্র মুক্তা ছিটাইতেছে। বামপার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীর। একটু সোপানের মত স্থান দিয়া নামিয়া ঘুরিতেই চক্ষের সম্মুখে ঈপ্সিত লছমনঝোলা দেখিলাম।

কাছেই লছমনদেবের মন্দির। নিকটবর্ত্তী স্নানঘাটে দুইজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিলেন। বিদেশে বিশেষতঃ দুর্গমস্থলে স্বদেশবাসী দেখিলেই ইচ্ছা করে আলাপ করি কিন্তু বেলা বাড়িয়া যাইবার ভয়ে সে ইচ্ছা দমন করিলাম। সামান্য বিশ্রাম করিয়া লছমনঝোলা পার হওয়া গেল। সকলেই জানেন এখন

পূর্ব্বেকার মত বিভীষিকাময় রজ্জুর ঝোলা সেতু নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী রায় বাহাদুর সূরযমল এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সেতুর উপর পিচ্ গলাইয়া ঢালা। সূর্য্যোত্তাপে গরম হইয়া উঠিয়াছে। সেতু দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি লোক বলদ তাড়াইয়া আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে পড়িলাম ; কোনও রকমে সঙ্কীর্ণ সেতুর একপাশে দাঁড়াইয়া প্রাণে বাঁচিলাম। পথের আর একটী সেতুও তাঁহার অর্থে নির্ম্মিত। এই পরহিতকামী দানবীরের ভারতের বহু তীর্থস্থানে বহু ধর্ম্মশালা আছে।

লছমন ঝোলা

ওপারে যাইয়া বাঁহাতী একটী সরু পথ দেখিলাম। এইটীই দুর্গম ও পবিত্র তীর্থ বদরিকাশ্রমে যাইবার পথ। কতকগুলি যাত্রী সেই পথে ফিরিয়া আসিতেছিল ও যাইতেছিল। যাহারা যাইতেছিল তাহাদের মুখের ভাবে কেমন একটী আশা নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। লছমনঝোলার নিকটে আসিয়া তাহারা সমস্বরে

"জয় বদরীনারায়নকী জয়" বলিয়া সেতু পার হইয়া যাইতেছে! যাহারা যাহারা ফিরিয়া আসিতেছিল তাহাদের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি তাহাদের বিশ্বাস! কি তাহারা দর্শন পাইয়াছে বলিয়া আশ্বাস ও শান্তি।

ডানহাতী আবার ঝাম্‌পানে চড়িয়া চলিলাম স্বর্গাশ্রমের দিকে। শুনিয়াছিলাম স্বর্গাশ্রম নামক আশ্রমটী একটী সদাব্রত ও ব্যবস্থা অতি সুন্দর। গঙ্গায় কাঠের শ্লিপার ভাসাইয়া দিয়াছে, হৃষীকেশে এই সব ধরিয়া কাঠের ভেলা তৈরী করিয়া বাহিয়া লইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম এই সমস্ত কাঠের শ্লিপার বদরিকা-শ্রমের দিক হইতে প্রস্তুত করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জলস্রোতে ইহা বেশ ভাসিয়া আসে। ঝাম্পানবাহকদিগের মধ্যে একজন বাহক অতি কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে কেন এরূপ কষ্ট ও শ্রমসাধ্য কাজে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় ললাটে হস্ত স্পর্শ করিল। জিজ্ঞাসা করাটা আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল, সাধ করিয়া যে কেহ ইহা করে না আমার বোঝা উচিত ছিল, অজ্ঞাতে তাহাকে ব্যথা দেওয়ায় অনুতাপ হইতেছিল। পথের অফুরন্ত শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে-ছিলাম। জানি না আর কোনও দিন এইরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখিব কি না, বুভুক্ষিতের মত চারিদিকে চাহিতে ছিলাম। স্বর্গাশ্রমে পৌঁছিলাম। একদিকে পর্ব্বত শান্ত, স্থির, অনন্ত, অসীম, অন্যদিকে খরতরঙ্গা গীতমুখরা গঙ্গা, মধ্যে সমতল ভূমির উপরেই এই আশ্রমটী সত্যই যেন স্বর্গাশ্রম। প্রাণ ভরিয়া ঠাণ্ডাজল পান করিলাম। কেহ কেহ ঠাণ্ডাই নামক সরবৎ খাইলেন। আশ্রম-বাসীরা আমাদিগকে ভাত কিম্বা পুরী খাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আমরা খাইলাম না। কিছু প্রণামী দিয়া আশ্রমের পারাপারের জন্য যে নৌকা আছে তাহাতে পার হইলাম। পারাপারের জন্য কিছু তাহারা লন না, ইহাও সদাব্রতের একটী অঙ্গ। বাবা কালী কম্‌লীওয়ালা শঙ্করাচার্য্য আশ্রমের গুরু।

পার হইয়া একটু হাঁটিয়াই সেই ঠাকুরবাড়ী দেখা গেল এবং সেই চৌকীখানির উপর আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা। বাড়ী ফিরিতে হইবে মনে হইল। হর্ণ বাজাইয়া মোটর ছুটিয়া চলিল। প্রায় ছ' মাইল আসার পর হঠাৎ মোটরের টায়ার ফাটিয়া গেল। আমরা নামিয়া কাছেই একটী ছোট গিরিনদী

কুলু কুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছিল তাহাতে হাত মুখ ধুইলাম। নদীটীর উপর একটী সেতু আছে। সেতুর উপর বসিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিলাম ওদিকে মোটর মেরামত চলিতে লাগিল। নদীটীর দুধারে বেতবন কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই বেতের চেষ্টায় ঘুরিতেছিলেন, ঘণ্টাদুই পরে মোটর মেরামত হইয়া গেল, আমরা চলিলাম। রৌদ্রে চারিদিকের পাহাড় তাতিয়া গরম বাতাস বহিতেছিল, আমরা কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিলাম। ৪টার পরও সেই রাস্তায় লোক ও গাড়ী চলিতে দেখিলাম। সবই চক্ষে নূতন লাগিতে লাগিল, ইহা বোধ হয় কখনও পুরাতন হয় না।

হরিদ্বারে বাসায় পৌঁছিয়াই তাড়াতাড়ি গঙ্গার ধারে স্নানার্থে চলিলাম কারণ লছমনঝোলায় স্নানের সুবিধাসত্বেও স্নান করিতে পাই নাই। তখন পুষ্পসম্ভার হস্তে দলে দলে নর নারী বিচিত্র বেশে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের অভিমুখে চলিয়াছে উদ্দেশ্য পুষ্প-গুলি "গঙ্গামায়ীকে" অর্পণ করিবে। সোপানের উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম ওপারে ক্যানালের লক্ খুলিয়া দিয়াছে, কি ভীষণ গর্জ্জনে জলরাশি ক্যানালের ভিতর আছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার উপর অস্তমান সূর্য্যের আভা পড়িয়া অপরূপ শোভা হইয়াছে। ঘাটের উপরে অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়াছিল, একজন একতারা বাজাইয়া গান করিতেছিল। এমন সময় একটী হিন্দুস্থানী রমণী ভজন গাহিতে গাহিতে পুষ্পসম্ভার হস্তে আসিল ও ফুলগুলি এই ঘাটেই ভাসাইয়া দিল। সন্ধ্যাদেবী আর দেরী করিলেন না।—গঙ্গাদেবীর শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি আরম্ভ হইল—ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে।

নটবর চরিত

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ]

বর্ব্বর গ্রামে নটবর নামে আছে এক মহাশয়,
ধরে নটবর যেই কলেবর বর্ণিতে মানি ভয় ;
মাথাটি তাহার বেলের আকার, সজারু কাঁটার চুল,
দুটি টিপ্ হেন, চোখ দুটি যেন করে সদা টুল টুল ;
রসিক সুজন, নটবর পদ্ম-লোচনই বটে।
সিন্দুর বরণ ইঁদুর লোচন লাল হ'য়ে থাকে চটে ;
অতি পরিপাটি তাহার নাসাটি আছে কিনা ভ্রম হয়,
হেরি' সে বদন মকর কেতন হেঁট মাথে চেয়ে রয়,
গম গম রবে, কথা বলে যবে, ছেলেরা চম্‌কে ওঠে ;
নিবিষ্ট মনে যদি কেহ শোনে তবে কিছু বোঝে বটে ;
শ্রীকর্ণ দু'টি করে ফুটি ফুটি ফোটে নাই শুধু লাজে,
কি জানি কি শেষে কা'রো কথা এসে কর্ণ পটাহে বাজে ;
কণ্ঠেতে আঁটা রয়েছে মাথাটা স্বীকার করিবে সবে,
কিন্তু গলাটা খুঁজিয়া মেলাটা কঠিন একটু হ'বে,
অর্থাৎ কিনা ঘাড় গর্দ্দানা কোলাকুলি করে আছে,
মাথা যদি হায় দূরে থেকে যায় প্রাণটা কিরূপে বাঁচে ?
যা' হোক, তা' হো'ক গলাটার শোক, পুষিয়েছে দেহটায়,
ঢোলের গুঁড়িটা তাহার ভুঁড়ীটা দেখে হাতী লাজ পায় ;
উপরে ইহার আরো চমৎকার কহিতেছি ভাই নিটু,
ভালুকের মত লোমে আবৃত সকল বুক ও পিঠ ;
দু'হাত দু'পায় ভাব অতিশয় একরূপ দু'জনায়,
খ্যাংরা কাটির উপমা জাহির করি তবে থাপ খায়।

রূপের কথাই বলিয়া মাতাই গুণের কথাও কই—
গুণেও নধর শ্রীল নটবর মহাশয় অতিশয়ই,
না জানে পড়িতে, নাহি পারে দিতে আঁচড় "ক" এর পিছু.
অতবড় ভূঁড়ী, দিলে সাত তুড়ি নাহি বাহিরায় কিছু,
মেঘে মেঘে মেলা হ'য়ে গেছে বেলা বয়স হয়েছে ঢের,
আগেই হেস না,—তথাপি জানে না কা'কে বলে মন 'সের' ;
জানিবার মত, আছে কত শত, কিছু জানিল না তা'র,
খাইয়া, শুইয়া, দেহটি ব'হিয়া, করিতেছে দিন পার।
তোমরা কি চাও, যদ্যপি পাও, ওই রূপ, গুণ ভাই ?
আবার হাসিছ! ওই সে আসিছে, এখন পালিয়ে যাই।

জালিম সিংহের মাঠ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাঙ্‌লার নবাব সরফরাজ খাঁর সঙ্গে বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁর বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দী আর হাজি আহম্মদ্ দুই ভাই, খুব বুদ্ধিমান্ আর কাজের লোক। সরফরাজের পিতা নবাব শুজা খাঁ হাজিকে নিজের মন্ত্রী, আর আলিবর্দ্দীকে বিহারের শাসনকর্ত্তার কাজে বহাল করেন। শুজা নিজেও ছিলেন ভাল লোক, মন্ত্রীও পাইয়াছিলেন ভাল। প্রজারা তাঁর আমোলে খুব সুখে-শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল। শুজার পুত্র সরফরাজ বাঙ্‌লার নবাবী পাইয়া ভারি সরফরাজি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেশের যাঁরা মাথা, যাঁদের লইয়া নবাবের নবাবী, সেই-সব বড় বড় জমিদারদের তিনি চটাইয়া দিলেন, আর মন্ত্রী হাজিকে করিলেন বরখাস্ত। শুধু মন্ত্রীকে বরখাস্ত

করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—তাঁহার যে-সব আত্মীয় নবাব-সরকারে চাকরী করিত, তাহাদের উপরেও অত্যাচার সুরু করিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেশের অসন্তুষ্ট লোকেরা সব এক-জোট হইয়া আলিবর্দ্দীকে জানাইলেন,—'নবাব সরফরাজের সরফরাজিতে বাঙ্‌লা দেশটা ছারেখারে গেল, আপনি আসিয়া যদি দেশ ঠাণ্ডা করেন, সিংহাসন জুড়িয়া বসেন, তাহা হইলেই আমরা বাঁচিয়া যাই। আসিলে আমরা আপনাকে টাকা দিয়া, লোক-লস্কর দিয়া সাহায্য করিব।'

বিহারে বসিয়া আলিবর্দ্দী এদেশের সকল খবরই রাখিতেন। ভাইকে বরখাস্ত, আত্মীয়স্বজনদের উপর অত্যাচার করার কথা তাঁহার কানে আগেই পৌঁছিয়াছিল। লোকেদের কথা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সরফরাজের রাজধানী ছিল, মুর্শিদাবাদে। আলিবর্দ্দী সৈন্যসামন্ত লইয়া ঐদিকে রওনা হইলেন।

মুর্শিদাবাদের পনের ক্রোশ উত্তরে একটা খুব বড় ময়দান আছে—নাম তার গিরিয়ার মাঠ। এই গিরিয়ার মাঠে আলিবর্দ্দীর সৈন্যের সঙ্গে নবাব সরফরাজের সৈন্যের লড়াই বাধিল। সে কি ভয়ানক লড়াই! কামানের আওয়াজ, হাতী-ঘোড়ার ডাক, সৈন্যদের চীৎকার—আকাশ-বাতাস যেন কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আলিবর্দ্দীর ওস্তাদ লড়াইওয়ালাদের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠা কি সহজ কথা? একে একে সরফরাজের ছোট-বড় অনেক সেনাপতিই কাৎ হইলেন। নবাব সরফরাজ এই দেখিয়া কি আর তাঁবুতে কাপুরুষের মতো চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন?—একটা বড় হাতীর পিঠে চড়িয়া নিজেই যুদ্ধে নামিলেন। কিন্তু সরফরাজের নবাবী করার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—বোঁ করিয়া একটা গুলি আসিয়া তাঁহার মাথায় বিঁধিল—সেই গুলিতেই তিনি মরিলেন।

সরফরাজের সৈন্যের পেছন দিক রক্ষা করিবার ভার ছিল—রাজপুত-সেনাপতি বিজয় সিংহের উপর। নবাব মরিয়াছেন—এই খবর যাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, অমনি তাঁর দলের অনেকে গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয় সিংহ রাজপুত—কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলান কাহাকে বলে, তিনি তা জানেন না। যুদ্ধ রাজপুতের কাছে খেলা—যুদ্ধে মরা তার পক্ষে মহাপুণ্য! বিজয় সিংহ

টপ্ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া, একটা ধারাল বল্লম-হাতে ছুটিলেন—আলিবর্দ্দীকে মারিবার জন্য ; কিন্তু হায়, শত্রুর গুলিতে তিনিও মরিলেন।

বিজয় সিংহের এক ছেলে ছিল—নাম তার জালিম ; বয়স তার বছর নয়। ছেলে-মানুষ হইলেও বীরের ছেলে বীর—যেন সিংহের শাবক। সে পিতার শোকে কাঁদিয়া মাটি ভিজাইল না। চারিদিকে আলিবর্দ্দীর বিজয়ী সৈন্যের হুঙ্কার! এখনি তাহারা তাহার বাপের মৃতদেহের উপর আসিয়া পড়িবে। হিন্দুর মৃতদেহ হিন্দু ছাড়া অন্য জাতের লোককে ছুঁইতে নাই। সেই দেহ অন্য জাতে ছুঁইবে, পায়ে মাড়াইবে, ইহা তো কিছুতেই হইতে পারে না। সে মরিবে, তাহাও স্বীকার, তবু যে পিতার স্নেহে সে মানুষ—যে পিতার রক্ত তাহার শিরায় শিরায়—সে পিতার দেহকে সে অশুচি হইতে দিবে না। বালক-বীর জালিম খাপ্ হইতে তলোয়ার টানিয়া বাপের মৃতদেহের কাছে দাঁড়াইল, আর সিংহের মতো গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—'হুসিয়ার! এখানে আমার বাপের মৃতদেহ,—যে কাছে আসিবে, তাহাকেই তলোয়ারের মুখে মাথা দিতে হইবে।'

বিপক্ষের সৈন্যেরা বালকের এই বীরত্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। হাতের তলোয়ারে তার আগুন জ্বলিতেছে। আলিবর্দ্দীর সৈন্যেরা যতই তাহার কাছে আসিবার চেষ্টা করে, বালকের হাতের বল যেন ততই বাড়িয়া যায়!

আলিবর্দ্দী বীরপুরুষ জ্ঞানিগুণী—তিনি বালকের এই অদ্ভুত সাহস, বীরত্ব আর পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তখনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন,—'খবরদার! বালককে কেউ কিছু বোলো না। আর আমার দলে যত হিঁদু-সৈন্য আছ, সবাই বালকের সহায় হও ; বিজয় সিংহের দেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করেন।'

হুকুম শুনিয়া হিন্দু-সৈন্যেরা খুব খুশি হইয়াছিল, তাহারা আনন্দের সঙ্গে বিজয় সিংহের দেহ কাঁধে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া চলিল, আর বালককেও আদর করিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গেল।

সরফরাজ যুদ্ধে হারিয়া মারা গেলেন, তাঁর সেনাপতি বিজয় সিংহেরও সৎকার হইল, কিন্তু তাঁর পুত্রের হার হইল না। সে পিতৃভক্তির গুণে শত্রুর হৃদয়ও জয় করিয়া গৌরব লাভ করিল।

নয় বছরের ছেলে জালিমের এই অদ্ভুত সাহস ও পিতৃভক্তির কথা সোনার অক্ষরে আজও ইতিহাসে লেখা রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ একটা মস্ত বড় ঘটনা, আর সেই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—জালিমের অদ্ভুত বীরত্বের কথা। যেখানে জালিম এই বীরত্ব দেখাইয়াছিল, লোকে আজও সেখানটাকে বলে—জালিম সিংহের মাঠ!

অণুবীক্ষণ

সব জিনিসের আকার সমান নয়—কেউবা ছোট, কেউবা বড়। এই সব ছোট বড় জিনিস আমরা চোখ দিয়ে দেখি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা' আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু এই সব ছোট ছোট জিনিস কি, কি রকম, তাদের কাজ কি জান্‌বার ইচ্ছা মানুষের হ'ল। তাইতে অনুবীক্ষণের জন্ম।
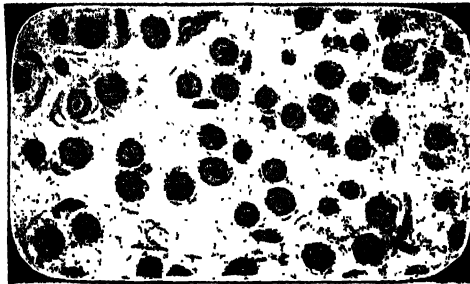
দাড়ী কামান গাল

অণুবীক্ষণের কাজ হচ্চে খুব ছোট জিনিসকেও বড় করে দেখান। এই অণুবীক্ষণ আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের যে কত উপকার হয়েছে তা বলা যায় না। ইংরেজীতে অণুবীক্ষণকে মাইক্রোস্‌কোপ্‌ বলে।

এই অণুবীক্ষণ কবে প্রথম আবিষ্কার হয়েছে তা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক যে, প্রথম চশমা আবিষ্কার হয়েছিল, তারপর অণুবীক্ষণ আবিষ্কার হয়েছে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন বহু প্রাচীন কালেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। কারণ প্রাচীনকালেও হীরা জহরৎ প্রভৃতি ছোট ছোট করে' গায়ে নানা দাগ কাটা হতো। অণুবীক্ষণের মতো দৃষ্টিশক্তি বাড়াবার কোনও যন্ত্র না থাক্‌লে এসব সম্ভব হতো না। তা' ছাড়া মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খুঁড়েও জিনিস বড় করে দেখাবার ভাঙ্গা কাচের টুক্‌রো পাওয়া গেছে।

রবার্ট হুক নামক এক পণ্ডিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বহু উন্নতি করেন। এখন নানা আকারের অণুবীক্ষণ বাজারে পাওয়া যায়। কল্‌কাতা ও মফঃস্বলের অনেক কলেজে অণুবীক্ষণ আছে। এক রকম অণুবীক্ষণ আছে যা বেশ পকেটে-ক'রে নিয়ে যায়। এগুলোকে স্ন্যাচেটের অণুবীক্ষণ বলে।

অণুবীক্ষণ সাধারণতঃ দুরকম—সাধারণ ও মিলিত। সাধারণগুণোর মুখে একটা কাচ থাকে, 'মিলিত'গুণোর মুখে দু তিনটা কাচ মিলিত হয়ে দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।

অণুবীক্ষণ দিয়ে কোনও জিনিস দেখ্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। যা কেউ কল্পনাও করেনি এমন সব জিনিস চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে।

এই যে বাতাস আমরা সর্ব্বদা দেখ্‌চি অণুবীক্ষণ লাগিয়ে দেখ দেখি। দেখ্‌বে কত ধূলোমাটী, কত রকম পোকা মাছির দল। এইসব আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে নিচ্চি—নাক ও মুখের মধ্য দিয়ে। ভাব্‌লে কি রকম মনে হয় বল দেখি ?

মানুষ দাড়ি কামায়। খুব ভাল করে' কামালে হাত দিলেও বোঝা যায় না যে কোনও দিন গালে দাড়ী ছিল। কিন্তু একবার অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখ্‌লে বল্‌বে ওমা, কি বিশ্রী! এত কাটাকুটো, এত দাগ!

মানুষের চুল দেখ্‌তে মসৃণ, তেলতেলে। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় চুলের গায়ে কত আঁশ। অণুবীক্ষণ সাহায্যে পুরুষ ও মেয়েমানুষের চুলের তফাৎও ধরা যায়। পুরুষের চুলের ডগা ভোঁতা। মেয়েদের চুলের ডগা

ঝাঁটার মতো ছেৎরাপড়া। বাড়ীতে চোর চুরী করতে এসে চুল ফেলে গেলে বলা যায় চোর পুরুষ কি মেয়েমানুষ।

চকখড়ি, যা দিয়ে ইস্কুলে বোর্ডে লেখা হয়, আবার দাঁত মাজা হয় তা একবার দেখ দেখি। দেখ্‌বে নানারকম শামুকের খোল আর শঙ্খের ছোট ছোট টুক্‌রো জড়াজড়ি করে রয়েচে।

রাত্রিরে জোনাকী পোকা উড়ে বেড়ায়, কেমন সুন্দর দেখায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে ল্যাজের দিকে দেখ। মেয়েদের চুলের ডগার মতোই ছোৎরাপড়া দেখ্‌বে।

মৌমাছি দেখেচো তো! হুল‌ও ফুটিয়ে দিয়েছে দুএকবার—চাক ভাঙ্গতে যেয়ে। হুলফুটিয়ে দেবার জন্য তাদের সূচ আছে; আর পায়ের কাছে থলি আছে। কিন্তু পায়ের দিকে থলি খালি চোখে তাকালে কিছু বোঝ্‌বার যো নেই যে অতবড় একটা থলি ওখানটায় বেমালুম রয়েচে।

মাকড়শা আবার হাসেন। শুনে বোধ হয় তোমাদের হাসি পাচ্চে। কেন? তুমি হাস্‌তে পার—তারা হাস্‌বে না কেন? বাস্তবিক অনেক জীব জন্তুই আমাদের মতোই হেসে থাকে। মাকড়শার হাসি দেখো। অণুবীক্ষণে দেখা যায় মাকড়শার চোখও আবার ৭।৮টা, পাও ঝাঁটার মতো।
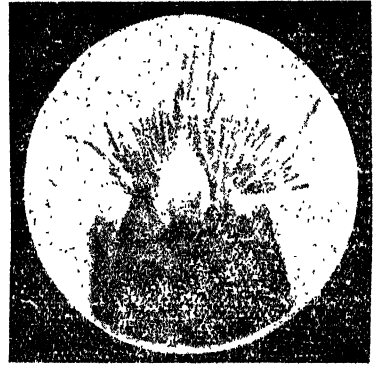
মাকড়শার পা

তোমার দেহের একফোঁটা রক্ত নিয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌বে তাতে কত পোকা কিলবিল্ করছে। এই সব পোকার কম বেশীতে আমাদের অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে। তাই অসুখ হ'লে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় কোন্ জাতীয় পোকা কত পরিমাণ আছে। কিন্তু শুধু চোখে এই মাপজোকের কাজ, পরিমাণ নির্ণয় করা চলে না। সেইজন্য একরকম যন্ত্র আছে যাকে বলে মাইক্রোমিটার: এই মাইক্রোমিটারের সাহায্যে মাপজোক্, প্রভৃতি করা হয়।

মানুষের শরীরে যে সব জীবাণু ঢোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা ফেটে বংশবৃদ্ধি করে ফেলে। এমনি করে একটা জীবাণু থেকে দেড়হাজার জীবাণু জন্মাতে দেখা গিয়েচে। বড় বড় পণ্ডিতরা হিসাব করে' দেখেচেন, তেমন সুবিধা পেলে একটা থেকে একদিনের মধ্যে প্রায় ১৪০০০০০০০০০০০০০০টা জীবাণু জন্মাতে পারে। তা'হলে কেমন তাড়াতাড়ি আমাদের দেহে রোগ ছড়িয়ে পড়ে ভাব দেখি, অণুবীক্ষণ দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করে ধরা যাবে কি রোগের জীবাণু। আর অমনি সেই রোগের ওষুধের ব্যবস্থা। অণুবীক্ষণ হওয়াতে রোগ সারবার কত সুবিধা হয়েচে।
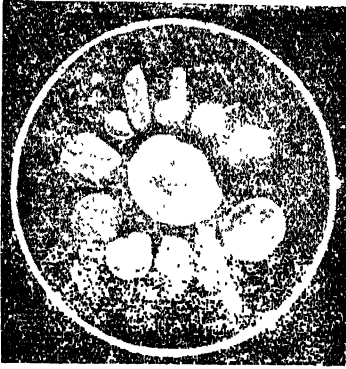
জীবাণু

খোকা

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

হাসি

হেসে উঠে খোকা তেম্‌নি,—
নিশা অবসানে পূবের আকাশে ঊষা হেসে উঠে যেম্‌নি!
শিখা শীষে হাসে যেমন আগুন
শীত শেষে হাসে যেমন ফাগুন
দখিন হাওয়ায় নীল সরোবর হিল্লোলে হাসে যেম্‌নি!
রাঙা টুকটুকে রঙীন দু'গাল,
ডালিম ফলানো গোলাপের লালে
আল্‌তার ছোপ্‌ আপেলের ছালে

বেদানার দানা যেম্‌নি !
খোকা হেসে উঠে তেম্‌নি !

চাওয়া

খোকা যেন চায় তেম্‌নি
অরুণ আভায় শিরীষ কেশরে শিশির শিহরে যেম্‌নি !
অঞ্জন আঁকা ডাগর দু'আঁখি,
হার মেনে যায় খঞ্জন পাখী,
কুঁড়ির পাপ্‌ড়ী খুলে ফেলে ফুল নয়ন ভুলায় যেম্‌নি !
মোমের অধরে মমতার ভাষা
আধ সুধা ধারা ভরা ভালবাসা
বরষার বারি বাড়ায় পিপাসা
চাতকের বুকে যেম্‌নি !
চায় যেন খোকা তেম্‌নি !

ঘুম্‌

ঘুম যায় খোকা তেম্‌নি—
মুদিত কমল মৃণাল শয়ণে ঢুলে পড়ে সাঁঝে যেম্‌নি !
কোন্‌ স্বর্গের স্বপ্নের ঘুম,
আঁখী পল্লবে দিয়ে যায় চুম্‌ !
ঝরা শেফালিকা মল্লিকা ফুলে বকুল বিছালো যেম্‌নি !
রাজার গলার গজমতি মালা
ফণীর মাথার মণি ঘর আলা
আরতি প্রদীপ কর্পূর জ্বালা
মন্দিরে শোভে যেমনি !
খোকা ঘুম যায় তেম্‌নি !

শিয়াল মোক্তার !

(সেকালের রঙ্ ও সঙ্)

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

একালের ছেলেদের সে কালের কথা বল্‌তে ভয় হয়, কারণ সে কালটা এ কালের মত সভ্য ভব্য ছিল না, তবুও পাঁচের ঘরে পা দিয়ে আমাদের সেই সুখের বাল্যকালের জন্য মধ্যে মধ্যে প্রাণ হাহাকার ক'রে ওঠে। সে কালের সুখ দুঃখের কথা এখন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, একালের ছেলেদের অনেকে হয় ত বিশ্বাস কর্‌তেই রাজী হবে না। কিছু কিছু বল্‌তে হচ্ছে। জন্মাষ্টমীর সময়ের কথাই লিখ্‌চি।

সে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা। তখন আমাদের বয়স এগার বার বৎসরের বেশী নয়। এই দুকুড়ি বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের কি বিষম পরিবর্ত্তন হয়েছে তা ভাব্‌লে অবাক্ হয়ে থাক্‌তে হয় ; মনে হয় এ যেন আর এক দেশ, আর এক সমাজ ! আমাদের সেই এগার বার বৎসর বয়সে যা দেখেছি একালে তা কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমার বেশ মনে পড়ে সে সময় আমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে বাজারে যেতাম। তিনি চাটুয্যেদের দোকানে একমণ চাল কিন্‌ছিলেন ; দোকানদার কালীবাবু (দোকানদার হ'লেও তাঁকে 'বাবু' না বল্লে তিনি রাগ কর্‌তেন, কারণ তিনি স্থানীয় জমীদার মুকুয্যে বাবুদের দৌহিত্র ছিলেন) ঠাকুরদাদাকে চালের নমুনা দেখিয়ে বল্লেন, "একমণের দাম আড়াই টাকা লাগবে।" ঠাকুরদাদা বল্লেন, "তোমরা দেখ্‌চি দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে না। সেদিন এই চাল ন' সিকে মণ কিনে নিয়ে গেলাম, আর আজ আড়াই টাকা দর হাঁক্‌লে !" চাটুয্যে মুখখানা হাঁড়ির মত করে বল্লেন, "কি করি খুড়ো, চড়া দরে কেনা। এবার যে 'প্রেকার' 'অজন্মা'—তাতে 'সন্দ' হচ্ছে দু'একমাস পরে এই চালই আপনাকে তিনটাকা তের সিকে মন কিন্‌তে হবে !"—চাটুয্যের কথা শুনে ঠাকুরদাদা দুইচক্ষু কপালে তুলে বল্‌লেন, "তবেই হয়েচে ! চালের মণ তিনটাকা

তেরসিকে হলে গুষ্ঠিশুদ্ধ উপোস করতে হবে।”—আজ চল্লিশ বৎসর পরে সেই চাল একমণ দশটাকায় কিন্‌ছি। এক, দু'বেলা আধপেটা খেয়ে দুইহাত তুলে একালকে আশীর্ব্বাদ করছি!

কেবল চাল কেন? সে সময় পাঁচু গরাইএর বাপ ক্ষেত্তর গরাই, আমাদের বাড়ীতে শরষের তেলের উঠনা দিত। একসের তেল দিয়ে তার দাম চোদ্দ পয়সা নিয়ে যেত। এখন পাঁচু একসের তেল দিয়ে চোদ্দআনা নিয়ে যায়; একদিন সে তেলের ভাঁড় হাতে করে আমার সাম্‌নে এসে বল্লে, “কর্ত্তা, এমাস থেকে তেল খুব সস্তা হয়ে গিয়েছে, বার আনা করে সের হয়েচে।” হায় রে সস্তা! যেখানে একদিন এক টাকায় দুসের ঘি কিনেছি, সেখানে আজ বার আনায় একসের তেল, সস্তা!—ঠাকুরদাদা আমার জলখাবারের জন্য প্রতিদিন একটি পয়সা দিতেন, তাতে, এক একটি রসগোল্লা পাওয়া যেত যেন এক একটা বিলাতী আমড়া; আর এখন এক পয়সার একটি রসগোল্লা যেন কল্‌কের ঠিক্‌রে, দেশী কুলের বিচি বল্লেও চলে! আমাদের বাড়ী পল্লীগ্রামে, আমাদের গ্রাম থেকে রেলের ষ্টেশন নয়ক্রোশ দূরে; সেকালে গরুর গাড়ীর ভাড়া লাগ্‌তো আঠার আনা, তার ওপর গাড়োয়ানকে একআনা জলখাবার দিলে সে বেচারা যেন হাতে স্বর্গ পেত; এখন সেই জায়গায় ভাড়া হয়েছে আঠার শিকে, তার ওপর যদি তাকে খোরাকী চারগণ্ডা পয়সার একটি পয়সা কম দাও, তাহলে সে মুখ আঁধার ক'রে বল্‌বে, “থাক্‌লো আপনার ভাড়া কত্তা, আর যে পারে সে যাক্, আমার কম্ম নয়!” দত্তদের ছোটকর্ত্তা হাবুবাবু একদিন চরণ মাঝির নৌকায় পনের ক্রোশ পাড়ী দিয়ে বাড়ী এসেছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি পথশ্রমে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে, কৃষ্ণনগরের ছয়ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাঙ্গাল্‌চির বাজারে এসে এক পয়সার মুড়িমুড়কি কিনে জল খেয়েছিলেন! একথা শুনে বড়কর্ত্তা বীরু বাবু (বীরেশ্বর) হতাশভাবে বলেছিলেন, “মোটে ত পনের ক্রোশ রাস্তা, এই পথটুকু আস্‌তে পথের মধ্যে ভাঁড়ার? তোরা দেখ্‌চি মানুষ হ'তে পাল্লিনে।”—একালে ট্রাম, ট্যাক্সি, সাইকেলে আমাদের পঙ্গু করে তুলেছে, উড়ো জাহাজ আমাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করতে এলে আমরা একদম্ নারদ ঋষি হয়ে পড়্‌বো।

সেকালের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে আমার সহপাঠিদের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের গ্রামে বহুকাল থেকে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে সময় আমি এই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের সঙ্গে আমাদের পাড়ার আর দুটি সুবোধ গোপাল বিদ্যাভাস কর্‌তো। একজনের নাম মনোমোহন; তাহার বয়স কত অনুমান করা আমার অসাধ্য ছিল, কারণ আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তার চেহারার কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাইনি, আমরা যখন এ. বি. পড়ি তার পূর্ব্ব থেকে তৃতীয় শ্রেণী সে মৌরসী ক'রে নিয়েছিল; দুই একবৎসর পরে যাঁরা বিশ্ববিদ্যার মহাসমুদ্র চতুষ্টয় পার হয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের দুই একজনের মুখে শুনেছিলাম, মনোমোহন তাঁদেরও 'কেলাস ফ্রেণ্ড।' মনোমোহন আমাদের প্রতিবেশী ছিল, তার বাবা স্থানীয় মুন্‌সেফী আদালত বাঙ্গলানবীশ উকীল ছিলেন; তিনি যখন উকীল হয়েছিলেন, তখন ওকালতী পরীক্ষার সৃষ্টি হয়নি। জজের সেরেজদারকে পূজায় খুসী কর্‌তে পার্‌লে তাঁর অনুগ্রহে জজ সাহেবের সহি মোহরযুক্ত ওকালতীর সনন্দ পাওয়া যেত, ব্যস্‌, তারপরেই ওকালতী সুরু! কি মজার কালই গিয়েছে। মনোমোহনের বাবা এই জাতীয় উকীল ছিলেন; আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে তাঁর পৈতৃক বাড়ী। ওকালতী উপলক্ষে আমাদের বাড়ীর পাশে বাসা করেছিলেন। মনোমোহন ওরফে মনু তাঁর বড়ছেলে। মনুর পেটটি ছিল গণেশের পেটের মত,, তবে গণেশের রঙ ছিল লাল মনুর রঙ ছিল আব্‌লুষ কাঠের রঙ অপেক্ষা একটু ফিঁকে; তার গায়ে কালী ঢেলে পড়্‌লে মনে হতো মনু ঘেমেছে! গণেশের মত মনুর শুঁড় ছিল না বটে, কিন্তু তার জিভ সেই অভাব পূর্ণ কর্‌বার জন্য দিবারাত্রি আধ ইঞ্চি বেরিয়ে থাক্‌তো; অধর, ওষ্ঠ এবং দাঁত দু'পাটির সাধ্য কি তাকে ঢেকে রাখে! তার উপর সেই উদঘাটিত রসনা থেকে সর্ব্বক্ষণ লালা নিঃসৃত হয়ে সুগোল উদরটি রসার্দ্র করে রাখ্‌তো। আর তার হাসির বিরাম ছিল না। ক্লাসে প্রত্যেক ঘণ্টাতেই মাষ্টার মশায়রা তাকে গরুর মত করে ঠাঙ্গাতেন, কিন্তু লাঠি ভাঙ্গতো—আর হাসি বন্দ হতো না! তার উপর মনুর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। আমাদের থার্ড মাষ্টার জানকী অধিকারী মশায়ের চেহারাখানা

প্রায় 'আর্টষ্টুডিও'র যমের চেহারার মতই ছিল, তাঁর হাতের বেতখানিও যমদণ্ড অপেক্ষা বেশী পাতলা ছিল না। তিনি একদিন তৃতীয় ঘণ্টায় ক্লাসে একটা আঁক না লিখে একটি গাছ আঁকলো, এবং গাছের ডালের উপর একটি বানর এঁকে বানরের লেজে একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে তার নীচে লিখ্‌লে—

"জানকী মাষ্টারের লাঠীগণিত।"

মনুর পাশে ছিল তোতলা রজনী সরকার, সে মুনুর শ্লেটখানি হাত থেকে ফস্ করে টেনে নিয়ে জানকী মাষ্টারের হাতে দিলে। জানকী মাষ্টার স্নুতো বাঁধা চশমার ভিতর দিয়ে মনুর শ্লেটে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন, আর মনুর হাতে, মাথায়, পাঁজরে, পিঠে লাঠীগণিতের মহিমা বর্ষণ করতে লাগ্‌লেন। মনু নির্ব্বিকার চিত্তে লালা বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লো। শেষে জানকী মাষ্টার তাকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে শ্লেটখানি তার হাতে দিয়ে আঁক কস্‌তে আদেশ কর্‌লেন, মিনিট পনের পরে জানকী মাষ্টার বল্লেন, "মনু আঁক হয়েছে ?" মনু অবলীলাক্রমে বল্‌লে, ঠিক মিলে গেছে সার !"

'দেখি' বলে জানকী মাষ্টার শ্লেটখানা মনুর হাত থেকে টেনে নিয়ে দেখ্‌লেন, তাতে লেখা আছে—

"থার্ড কেলাসে থার্ড মাষ্টার থার্ড জানুয়ারী,
করে দিলে বেঞ্চির ওপর মোহন বংশীধারী।
বাঁশি ডাকে রাধা রাধা শুনে আয়ান ঘোষ,
ঠ্যাঙা হাতে ছুটে আসে যেন একটা মোষ !"

জানকী মাষ্টার শ্লেটখানি নিয়ে হেডমাষ্টারকে দেখাতে চল্লেন, সেই স্নুযোগে মনু এক লাফে ক্লাশ থেকে বেড়িয়ে পড়ে চম্পট দান কল্লে।

পরদিন দেখা গেল স্কুলের সদর দরজার মাথায় একখান কাগজ ঝুল্‌ছে, প্রথমেই মোটা মোটা হরফে লেখা, "অথ মাষ্টার বন্দনা।"—তার নীচে একটু ছোট হরফে একটি কবিতা, বা ছড়া, যথা—

"হেডমাষ্টার মদে কাগড় ;
তার নীচেতে গোপ্‌লা ধাঙড়,

গোপ্‌ত্রা পাঁড়ের নেইকো রাগ,
তারপরেতে জানকী বাঘ ;
ল্যাজ খসে তার গজালো টিকি,
তার নীচে বেজা টিক্‌টিকি !
বেজা মাষ্টার গুলি খায়,
পোদ্দার পণ্ডিত ক্লাসে ঘুমায়।
পোদ্দারের পো পণ্ডিত হ'লে
বাপকে বাড়ীর কৃষাণ বলে।"

গুণবর্ণনা নাকি ঠিকই হয়েছিল। আমাদের পণ্ডিত পোদ্দার মশায়ের বাপ লেখাপড়া জান্‌তেন না, বাড়ীতে বসে পাট কাট্‌তেন। ভিন্ন গ্রামের কোন ভদ্রলোক তাঁকে চিন্‌তে না পেরে পোদ্দার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পাট্‌ কাট্‌চে—লোকটা কে মশায়!"—পণ্ডিত নাকি অসঙ্কোচে বলেছিলেন, "ও আমাদের বাড়ীর কৃষাণ!"

আমাদের প্রতিবেশী অন্য 'ব্ল্যাক ফ্রেণ্ডের' নাম পূর্ব্বেই বলেছি, সেই রজনী সরকার। সে ছিল তোত্‌লা, আর তার পিতাঠাকুর হারাণ সরকার ছিল কালা। হারাণ সরকার গাছতলার মোক্তার ছিল। 'গাছতলার মোক্তার' কোন্‌ শ্রেণীর জীব, তা আমার জানা নেই, তবে দেখ্‌তাম সে মহকুমার আদালত সন্নিহিত গাছ তলায় তার দপ্তর খুলে বস্‌তো, যাঁরা মামলা কর্‌তে আস্‌তো তাদের দরখাস্ত টরখাস্ত লিখে দিত, আর দুই একটা ছুটো মক্কেল জুটোতে পার্‌লে তাদের নিয়ে গিয়ে কোন কোন মোক্তারের জিম্মা করে দিত, এজন্য সেই মোক্তারের কাছে টাকাটা শিকেটা 'কমিশন' পেত। কখন বা কোন মক্কেলের কাছে দশটাকায় তার মামলা ফুরণ করে নিয়ে, কোন মোক্তারকে পাঁচ টাকা দিয়ে মামলা করে দিত, বাকি পাঁচ টাকা নিজে গ্রাস কর্‌তো। বোধ হয় এই রকম উঞ্ছবৃত্তির নামই 'গাছতলার মোক্তারী'।

হারাণ সরকারের ইচ্ছা ছিল রজনী কোন রকমে এণ্ট্রেন্সটা পাশ কর্‌তে পার্‌লে তাকে মোক্তার করবে। কিন্তু তার এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাপের উপর রজনীর অসাধারণ ভক্তি ছিল; একটা দৃষ্টান্ত দিই :—

সরস্বতী পূজার সময় আমাদের স্কুলে বাগ্‌দেবীর পূজা হতো। চাঁদার জন্য হারাণ সরকারের দ্বারস্থ হওয়া গেল। রজনী তখন বাজারে বেরুচ্চে, তার বাবা তেল মাখ্‌চে। কালার সঙ্গে আলাপ করা দায়, সুতরাং রজনীকে বল্লাম— তোর বাবাকে বল্ আমরা সরস্বতী পূজোর চাঁদা নিতে এসেছি। তোত্‌লা রজনী তো-তো করে তার বাপকে আমাদের শুভাগমনের কারণ বল্লে। চাঁদা দেওয়ার আশঙ্কায় কালা আরও বেশী রকম কালা সেজে বল্লে 'এ্যাঁ কি বল্লি?'—রজনী যথেষ্ট আয়াস

স্বীকার করে বক্তব্য বিষয়টা নিবেদন করেছিল, তদুত্তরে তৈলাক্ত পিতৃদেবের কণ্ঠনিঃসৃত 'এ্যাঁ কি বল্লি' শুনেই মরদ রেগে আগুন হয়ে উঠ্‌লো, চীৎকার করে বল্লে, "কে-কে ফেল্লে ব্যা-ব্যা ব্যাআ-ব্যা আ-টা ঠ-ঠ-ঠসা আ-আ-আবার চা-চা-চার দ-দণ্ডের ফ্যা-ফ্যা-ফ্যারে!" কালা একথায় গামছা কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো,

চক্ষু রক্তবর্ণ করে বল্লে "অসভ্য চাষা, ভদ্রলোকের ছেলেদের সাম্‌নে আমাকে হ্যানেস্তা! আমাকে বলিস্ ব্যাটা ঠসা, আজ তোর পিঠে নাদ্‌না ভাঙ্গবো।" রজনী ত রুখে দাঁড়াল। পিতা পুত্রে মল্ল যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে আমরা তৎক্ষণাৎ, সেই মল্লভূমি থেকে প্রস্থান।

কিন্তু রজনীর লেখা পড়ার প্রতি তার বাপের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এবং দুষ্ট ছেলেদের সংসর্গে মিশে সে যাতে জানোয়ার হয়ে যেতে না পারে সে জন্য তাকে বাড়ীতে সকালে বিকালে কয়েদ করে রাখ্‌তো। কিন্তু রজনীকান্ত একটু ফাঁক পেলেই ছেলেদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে বেড়াত। মনুদের বাসায় বাগানে দুই তিনটা পেয়ারা গাছ ছিল, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এই গাছগুলিতে বিস্তর পাকা পেয়ারা পাওয়া যেত—এজন্য সে সময় মনুদের বাড়ীতে সকালে বিকালে অনেক ছেলে জুট্‌তো। হাসি, গল্প, গানে মুনুদের সেই ক্ষুদ্র বাগান সজীব হয়ে উঠ্‌তো রজনীও সেখানে এসে জুট্‌তো।

মনুদের আটটা হাঁস ছিল ; কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে শিয়াল পণ্ডিতেরা তার অর্দ্ধেক সাবাড় করে দিলে। এজন্য একদিন বিকালে আমরা শিয়াল মারবার পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌লাম। শ্রাবণের অপরাহ্ণ, কালো মেঘে চারি দিক ঢাকা, ঘণ্টা খানেক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে ; মনুর বাবা বাসায় না থাকায় তাঁর কাছারী ঘরেই আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু শিয়াল মারার কোন ফন্দীই আমাদের মনোমত হলো না। রজনী প্রস্তাব কল্লে ফাঁদ পেতে শিয়াল ধরা যাক্ তার পর ঠেঙ্গিয়ে মারা যাবে। আমরা ফাঁদ পাত্‌তে জানতাম না। রজনী বল্লে, তাদের আড়পাড়া গ্রামে শিয়ালগুলো শীতকালে খেজুরে গুড়ের 'বাইনে' প্রবেশ ক'রে বড় ক্ষতি করতো, এজন্য বাগদীরা ফাঁদ পেতে দুই তিনটা শিয়াল ধরেছিল ; তার পর আর সেদিকে কোন শিয়াল ঘেঁস্‌তো না। রজনী বাগদীদের কাছে ফাঁদ পাততে শিখছিল। সে তো-তো ক'রে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই যে, একটা বড় বাঁশ, একগাছা কুয়োর দড়ি, খানিক সরু শক্ত সুতো ও একখান খন্তার যোগাড় হলেই সে ফাঁদ্ পাত্‌তে পারে। এ সকল জিনিস সংগ্রহ করতে বেশী দেরী হলো না। মনুদের বাসার পাশে সেই ক্ষুদ্র বাগানটিতে প্রত্যহ সন্ধ্যার

সময় শিয়ালের দল এসে হুক্কাহুয়া রবে সন্ধ্যা বন্দনা করতো; এইজন্য সেই বাগানেই ফাঁদ পাতা স্থির হলো। রজনী কুড়ি হাত লম্বা বাঁশখানা একটা গর্ত্ত খুঁড়ে শক্ত করে পুতলে, কুয়োর দড়ি গাছটা সেই বাঁশের আগায় আগেই বাঁধা হয়েছিল, দড়িগাছটা ঝুল্‌তে লাগ্‌লো। বাঁশের গোড়া থেকে হাত দুই তফাতে একটা ছোট গর্ত্ত করা হ'ল। কুয়োর দড়ির যে মুড়োটা ঝুল্‌ছিল, দু'জন ছেলে তা জোর করে টেনে সেই গর্ত্তের উপর নুইয়ে ধরলে, তাহার আগায় শক্ত শনের দড়ি দিয়ে একটা ফাঁস বেঁধে সেই ফাঁসটা গর্ত্তের ভিতর কৌশলে ছড়িয়ে রাখা হলো; বাঁশের আগাটা গুণ দেওয়া ধনুকের মত নুইয়ে থাক্‌লো। শিয়ালগুলো পাকা কাঁঠাল খুব ভালবাসে বলে, মনু বাড়ীর ভিতর থেকে খানিক কাঁঠালের ভুতি এনে দিলে; শ্রীমান্ রজনীকান্ত সেটা সেই ফাঁদের মধ্যে স্থাপন কল্লে। ফাঁদটা এরকম কৌশলে পাতা হলো যে, শিয়াল সেই কাঁঠালের ভুতিতে মুখ দিয়ে ঠেলা-ঠেলি কল্লেই ফাঁদের দড়ি ফস করে তার গলায় বেধে এঁটে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুয়োর দড়ি আল্‌গা হবে, এবং বাঁশের আগাটা তীর বেগে সোজা হয়ে উঠ্‌বে; তৎক্ষণাৎ শিয়ালটা গলায় ফাঁস নিয়ে পাঁচ ছয় হাত উঁচুতে উঠে ঝুল্‌বে। শিয়াল ভুতি খেতে এলে কি মজা হবে, তা কল্পনা ক'রে সাফল্য লাভের পূর্ব্বেই আমরা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করে দিলাম।—এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাগানের পাশে পথের দিকে গর্জ্জন শুন্‌লাম, "রোজো! রোজো ওখানে আছিস্?" বুঝ্‌লাম রজনীকান্তের পরম পূজনীয় পিতা ঠাকুর হারাণ সরকার পুত্রের সন্ধান করতে এসেছে! কিন্তু তখন আর তার পলায়নের উপায় ছিল না। হারাণ সরকার তৎক্ষণাৎ বাগানে প্রবেশ করে রজনীর কান চেপে ধর্‌লে, সরোষে বল্লে, "পড়া নেই, শুনা নেই, পাড়ার যত গাধার সঙ্গে মিশে সমস্ত দিন আড্ডা মারা হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া ভূত। কি হচ্ছে তোদের এখানে?" মনু তার লালাসিক্ত রসনা সংযত করে বল্‌লে, "আমরা ফাঁদ পেতে শিয়াল ধর্‌ব। শিয়ালে আমার চারটে হাঁস খেয়ে ফেলেচে।"

এই বার পূর্ব্বোক্ত ফাঁদের প্রতি মোক্তারজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। সে রজনীর কান ছেড়ে দিয়ে বল্লে, "যত বেল্লিক এক জায়গায় জুটেছে! দাঁড়া তোদের

ফাঁদের দফা রফা করি।" আমরা তাকে বাধা দেওয়ার আগেই সে সেই ফাঁদের কাছে দৌড়িয়ে গেল, এবং ফাঁদের ভিতর পা দিয়ে সেই কাঁটালের ভুতির উপর সবেগে মারলে এক লাথি!

তার ফল যা হলো বুঝতেই পারচো। যেমন পদাঘাত, আর চক্ষুর নিমেষে বাঁশের নোয়ানো আগা সোজা হয়ে গেল, আর গাছতলার মোক্তার হারাণ সরকারের

পায়ে ফাঁস বেধে তাকে সাত হাত উঁচুতে তুলে ফেল্‌লে! মোক্তারজি ঊর্দ্ধপদ হেটমুণ্ড তপস্বীর মত অধোমুখে সেই কুয়োর দড়িতে ঝুল্‌তে লাগ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ, "ওরে বাপ্‌রে! গেলাম, মলাম; ফাঁদে ঠ্যাং বেধে গিয়েছে; আমাকে নামিয়ে নে, নামিয়ে নে! এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্!"

আর উদ্ধার কর। হারাণ সরকারকে ঠ্যাংএ দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুল্‌তে দেখে আমরা তিন লাফে পগারপার! মনু রাস্তায় এসে চেঁচিয়ে বল্লে, "পাড়ার লোক সব দৌড়িয়ে আয়, কাঁটালের ভুতি খেতে এসে ফাঁদে দো পেয়ে শিয়াল পড়েছে!"

পাড়ার চার পাঁচ জন লোক তাড়াতাড়ি মনুদের বাগ'নে গিয়ে দেখ্‌লে মোক্তারজি অধোমুখ হয়ে বাঁশে ঝুল্‌চে!

মাদুঘোষ বল্লে, "আরেঃ! এযে সরকার মোশাই। শেয়ালের ফাঁদে আপনি ঝুল্‌চো? নেশাটেশা করে নাগর দোলায় চড়েচো নাকি, মোক্তার মোশাই!"

সরকার দুই হাত যোড় করে বল্‌লে "আগে আমাকে নামিয়ে নে বাবা! প্রাণ রক্ষে হোক্, তারপর তোরা যত খুসী জেরা করিস্।"

দুই তিন জন ধরাধরি করে হারাণ সরকারকে মুক্তিদান কর্‌লে। হারাণ সরকার সবিনয়ে বল্‌লে, "দেহে প্রাণ এলো, বাবা! কে জান্‌তো শিয়াল ধরা ফাঁদ এমন 'সর্ব্বনেশে' জিনিস্? দেখিস বাবা সকল, কথাটা যেন 'প্রেকাশ' না হয়। বড় নজ্জার কথা!" কিন্তু কথা 'প্রেকাশ' হতে বিলম্ব হলো না। কয়েক দিন প'রেই জন্মাষ্টমী, বৌবাজারে'রা ঠাকুর বিসর্জ্জনের দিন জন্মাষ্টমীর সঙ্ বের করে; বৌবাজারের রামলাল কুণ্ডু সঙের বিষয় নির্ব্বাচন কর্‌তো আর গান বাঁধ্‌তো। সেবার জন্মাষ্টমীতে সঙ্ বেরুলো শিয়াল মোক্তারের পায়ে ফাঁসি।

সেইদিন থেকে হারাণ সরকারের নাম হলো "শিয়াল মোক্তার!"

দুলাল

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।]

কাজ ভুলান দুলাল আমার
বসল এসে কোলটি জুড়ে,
রচি তিলক, পরাই কাজল,
দুধ মুখে দি ঝিনুক পূরে !
দুধে ভরা, যত কড়া,
বলক ধরে উত্‌লে পড়ে,
উঠ্‌তে গেলে পাগল ছেলে
কেঁদে কেঁদে জড়িয়ে ধরে !
আব্দারে তার বাণী হারে,
হয়না যাওয়া, একটু দূরে !
দেখে, বৃথা অপচয়,
প্রাণে বড় ব্যথা হয়
তিলেক যদি, উঠি চলি
রক্ষা তবে নাহি রয়,
মাটির পরে আপসে পড়ে
কাঁদন ভুলে আটাস্ ধরে,
সেই কাঁদন বাজে নূপুর বাজে
মোর নিরাশা অন্তঃপুরে ।

বীণার তান

(শ্রীনিশিকান্ত সেন)

অযোধ্যা রাজ্যে একজন খুব ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়ে ছিল, বীণায় তার মতো মিষ্টি হাত আর কারো ছিল না। নাম তার মধুব্রত। যখন সে বীণা বাজিয়ে গান করত, তখন বনের যে অচল অটল গাছপালা, পাহাড়পর্ব্বত, তারাও যেন চঞ্চল হয়ে নেচে উঠ্‌ত; আর বাঘ ভালুকের মত অশান্ত পশুরাও সুবোধ বালকের মতো শান্ত শিস্ট হয়ে চুপ করে বসে থাক্‌ত।

এখন এই মধুব্রতের ছিল খুব সুন্দর একটি লক্ষ্মী বৌ। নাম তার নান্দী। সে যে অবাক হয়ে স্বামীর বীণার তান শুনবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! গান শুন্‌তে শুন্‌তে সে তার সখা সখী, আত্মীয়স্বজন এমন কি নিজের কথাও ভুলে যেত। কাজেই স্বামীর সঙ্গ পেলে, সে আর কিছুই চাইত না। এমন স্ত্রীকে আর কেনা ভালবাসে বলো? মধুব্রতও তাকে প্রাণের মতোই ভালবাসত। স্ত্রীকে গান শোনাতে পারলে সে আর কিছুই চাইত না—স্ত্রীকে গান শোনানোই ছিল, তার জীবনের সেরা আনন্দ। দুজনে মনের সুখে ঘরকন্না করত, আর সময় পেলেই গানবাজনায় মন দিত।

কিন্তু এত সুখ, এত আনন্দ কি মানুষের ভাগ্যে সয়? হঠাৎ একদিন বেড়াবার পথে ঘাসের ভেতর লুকানো একটা কেউটে সাপ ফোঁস করে ফণা ধরে নান্দীর পায়ে ছোবল মার্‌লে। বিষে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল। মধু তাকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টাযত্ন কর্‌লে কিছুতেই কিছু হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সব শেষ হয়ে গেল।

মধুব্রত তখন কি আর করে বলো! অনেকক্ষণ ধরে অস্থির হয়ে কাঁদ্‌লে, তারপর সেই যে তার সুখদুঃখের দোসর বীণাটি, তাকেই কোলে তুলে নিলে। নিয়ে তার বুকে আস্তে আস্তে ঘা দিলে। বীণা বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু যে তার বীণার তান শুন্‌তে পেলে নাওয়া-খাওয়া হাসি ঠাট্টা খেলাধূলো সব ভুলে যেত, তার সেই সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী সাধের বৌ নান্দী আজ কোথায়? সুর বাজ্‌ল,

কিন্তু সে যেন সুর নয়—মধুব্রতের বুকফাটা দুঃখের কান্না, পশুপাখী তরুলতা কীটপতঙ্গ জনমানব যে তা শুনতে পেলে, কেউ চোখের জল রাখ্‌তে পারলে না।

সংসারটী মধুব্রতের কাছে বড় ফাঁকা বড় দুঃখের। তার বীণার তান আরো ঢের লোকে শুনতে চায়, তাকে আদর করে অনেকে কাছেও রাখ্‌তে চায় বটে; কিন্তু সে তা চায় না। সে চায় নান্দীকে গান শোনাতে, তার কাছে ছুটে যেতে। কিন্তু কোথায় নান্দী? বহু—বহু দূরে, ঘোর অন্ধকার, তুফানময়, পারকূলহারা বৈতরণী নদী পার হয়ে যমরাজ্যের এলাকায়। সেখানে কি কেউ জ্যান্ত যেতে পারে? কেউ পারে না। তবু মধুব্রতের মনে হল, সে যেতে পারে। তার যে সুখদুঃখের দোসর বীণাটি আছে, আর তা-থেকে সে নিজের হাতে যে আশ্চর্য্য মিষ্টি সুর তুলতে পারে, তারই দৌলতে মধু মৃত্যুকেও ফাঁকি দিয়ে সাধের স্ত্রী নান্দীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারে।

বীণাটি ঘাড়ে তুলে নিয়ে মধু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারপর কত পাহাড়পর্ব্বত ডিঙিয়ে, কত নদনদী পার হয়ে কত কষ্টের পর সেই কালনদী বৈতরণীর নাগাল পেলে। সে বিষম নদী কারো সাঁতরে পার হবার জো নেই। পারাপার করবার একমাত্র মালিক হচ্ছে, তারণ মাঝি। সে-ই সেই নদীতে খেয়া বায়। জ্যান্ত মানুষকে তার পার করে দেবার হুকুম নেই। তারপর তার মেজাজ ভারি কড়া। মধু যতই পার হবার জন্য কাকুতি-মিনতি করে সে ততই আগুন হয়ে ওঠে, তাকে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে। মধু বেগতিক দেখে তখন ঘাড় থেকে বীণা নামিয়ে তাতে সুর দিলে। যেমন দেওয়া অমনি সব থির। জলের ঢেউ থাম্‌ল, হাওয়ার ঝাপটা বন্ধ হল, আর তারণের রাগও একেবারে জল হয়ে গেল। সে আদর করে মধুকে নায়ে তুলে নিলে।

বৈতরিণী পার হয়ে যমপুরীর পাঁচীল আকাশে ঠেকেছে—দেখা যায়। নদী পার হয়ে মধুর মনে আশা হয়েছে যে এইবার নান্দীর সঙ্গে দেখা হবার আর বড় দেরি নাই। ব্যস্ত হয়ে মধু সদরের দোর দিয়ে ঢুক্‌তে যাবে, একটা কুকুর গোঙ্‌রাতে গোঙ্‌রাতে তেড়ে এল। কি ভয়ানক কদাকার দেখ্‌তে সে কুকুরটা! তেমন আর সে জীবনে দেখেনি। মাথা তার একটা নয়—তিনটে! আর সেই

তিনটে মাথায় ছ-ছটী চোখ, বাঘের চোখের মতো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে ! করাতের মতো দাঁতের পাটির ফাঁকে লক্ লক্ করছে লম্বা রক্তবর্ণ তিনটে জিভ ! দেখলে

ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। কিন্তু মধু ভয় পাবার পাত্তর নয় যে, সে তার বীণার গুণ জান্‌ত। কুকুরেরও তেড়ে আসা তারও বীণার সুর দেওয়া। সুর তো নয়, যেন যাদুমন্তর। কুকুরটা পোষা বেরালের মতো পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়্‌তে লাগ্‌ল। মধুকে তখন আর পায় কে! সে ফট্ করে যমপুরীর ভেতর ঢুকে পড়্‌ল

কিন্তু শুধু ঢুকে পড়লেই তো হয় না, যমপুরীর মালিক হচ্ছেন যমরাজ। তাঁর হুকুম না হলে যে কিছুই হবার জো নেই। চল্‌ল মধু তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে।

যমরাজ তখন সাজপোষাক পরে হাতে দণ্ড নিয়ে রাজসভা জম্‌কে বসেছেন। মধু জান্‌ত যে, দেখামাত্তর যদি সে যমরাজের মন ভেজাতে না পারে, তা হলে সেতো নান্দীকে পাবেই না, উল্টে তার আরো কঠিন শাস্তি হবে। সে জ্যান্ত মানুষ, হুকুম না নিয়েই যমপুরীতে ঢুকে পড়েছে। সভায় ঢুকেই মধু বীণা বাজিয়ে গান ধর্‌লে। কেন ঢুক্‌লে, কার হুকুমে ঢুক্‌লে যমকে সে কথা ভাব্‌বারও সময় দিলে না।

গান চল্‌তে লাগ্‌ল। নান্দীকে পেয়ে মধু কত সুখী হয়েছিল, তাকে হারিয়ে তার কত দুঃখ, কত কষ্টে সে বৈতরণী পার হয়ে যমরাজের দেখা পেয়েছে—এই সব কথা গানের সুরে শুনিয়ে দিলে। গান শুনে সারাটা যমপুরী যেন হায় হায় করে কেঁদে উঠ্‌ল—এমন প্রাণগলানো সে গান। যার মতো কঠিন প্রাণ আর কারো হয়নি—হবে না, সেই যমরাজেরও চোখ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। তিনি খুশী হয়ে মধুর সাধ পূরণ কর্‌তে রাজি হলেন। তবে বল্লেন যে, তাকে আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হবে। এই মৃত্যুপুরীর ভেতর জ্যান্ত মানুষে আর মরা মানুষে মিলন হতে পারবে না। মধু যখন যমপুরীর ভেতর দিয়ে যাবে, নান্দী অবশ্য তার পেছন পেছনই যাবে। কিন্তু মধু পেছন ফিরে চাইতে পার্‌বে না, চাইলেই সব ফাঁকি—নান্দীকে পাবার আর কোনো উপায় থাক্‌বে না। কিন্তু যদি সে পেছন ফিরে না-চেয়ে পার হয়ে যেতে পারে, তা হলেই সে নান্দীকে পাবে।

মধুব্রত রাজি হল। ভাব্‌লে, সে আর এমন বেশি কথা কি। এত কালই যখন নান্দীকে না-পেয়ে না-দেখে দিন তার কেটে গেছে, তখন এতটুকু সময় আর ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পার্‌বে না? খুব পার্‌বে। যমরাজকে প্রাণের আনন্দ জানিয়ে মধু মহা উৎসাহে দরবার থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। যদি পারে, চোখের নিমেষে যমপুরী পার হয়ে চলে আসে, এমনি তার মনের গতি। কিন্তু পথ যে বড় অন্ধকার, বড় আঁকা-বাঁকা—গোলক ধাঁধার মতো; সে কি সহজে শেষ হতে চায়! অনেক কষ্টে সে পথও প্রায় কাবার। সাম্‌নেই সদরের দোর। ঐটে কোনো রকমে পার হতে পার্‌লেই, বাস! সকল কষ্টের অবসান।

হঠাৎ খিল-খিল করে কে একটা বিকট হাসি হেসে উঠ্‌ল। হাসি যেন বলছে, সব ফাঁকি--সব মিছে কথা ভূয়ো। এই যে হাসি, এটা সত্যিকারের হাসি, না শয়তানের ধোকা, মধুব্রত তা বুঝতে পারলে না। ভড়্‌কে গিয়ে সে ভাব্‌লে, তবে কি সত্যি সত্যিই নান্দী তার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে না! এত কষ্ট করে আসা তার কি তবে সব মিছে হয়ে যাবে। যেমনি ভাবা, অমনি পেছন ফিরে চাওয়া, আর অমনি সব ফাক্কা! সঙ্গীতের শেষ পুরস্কারটি হাতের মধ্যে এসেও এল না-- মিথ্যে হয়ে মিলিয়ে গেল। বিদ্যুতের ঝলকের মতো শুধু একটিবার নান্দীকে সে চোখের দেখা দেখতে পেলে। শূন্যে মিলিয়ে যেতে যেতে মূর্ত্তি হাত বাড়িয়ে সে বল্লে, "আর আমি যেতে পারলুম না—বিদায়, বিদায়!"

তারপর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের সর্দ্দার যমদূতেরা তখন সব হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল, আর মধুকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে চল্ল। তখন আর তার হুঁস নেই—অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। হুঁস হলে দেখ্‌লে সে বৈতরণীর ওপারে নয়—এ পারে এসে পড়েছে। না-খেয়ে না-দেয়ে ঐ নদীর ধারেই সে অনেক দিন পড়ে রইল, তারণ আর তাকে দয়া করে পার করে দিলে না। লোকালয় তার কাছে বিষের মতো সে দিকে আর সে কেমন করে যায়! কাছেই একটা পাহাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, তাতে আছে সবুজ গাছপালা আর পশুপাখী। মধু দুঃখের দুঃখী বীণাটীকে হাতে নিয়ে সেই দিকে চল্ল।

তারপর ঐ পাহাড়েই তার বাস। কখনো আকাশের দিকে চেয়ে চুপটি করে বসে থাকে, কখনো বীণা বাজিয়ে গান গায়, কখনো বীণা হাতে পাগলের মতো পাহাড়ময় ঘুরে বেড়ায়। পাহাড়, পাহাড়ের বন, আর জন্তু জানোয়ার সবাই তাকে ভালবাসে। যে সব জানোয়ার মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায় তারাও তাকে কিছু বলে না, পোষা কুকুরের মতো তার গা-হাত-পা চাটে।

এমনি করে দিন যায়। একদিন মধু পাহাড়ের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন পাহাড়ে মেয়ে তার চোখে পড়ল। তারা তখন নানারকম ভঙ্গি করে নেচে নেচে গান গাইছে। কিন্তু এই নাচগানের আমোদ মধুর ভাল লাগবে কেন? পাশ কাটিয়ে সেখান থেকে চলে যাবে, এমন সময় মেয়েরা হুড়মুড় করে তার ঘাড়ের

ওপর এসে পড়্ল। তারা মধুর হাতে বীণা দেখ্তে পেয়েছিল, বল্লে “ওহে একটা সুর বাজাও না—ফূর্ত্তির সুর,—আমরা সব নাচব।”

নান্দীর মৃত্যুর পর মধু এক রকম জ্যান্তে মরা হয়ে আছে, ফূর্ত্তির সুর তার কোথা থেকে আস্বে। সে জড়সড় হয়ে বল্লে, “বাছারা আমায় মাপ করো, আমার মন ভাল না।”

কিন্তু পাহাড়ে মেয়েরা কি কথা শোনবার মেয়ে! তারা শক্ত হয়ে বল্লে, “বাজাতেই হবে ফূর্ত্তির সুর, না বাজালে কিছুতেই তোমাকে আমরা ছাড়ছি নে।”

মধু তবু বীণায় সুর দিলে না, কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাহাড়ে মেয়েরা রাগে জ্বলে উঠে বল্লে, “বটে! এতদূর আস্পর্দ্ধা—আমাদের কথা অগ্রাহ্যি! রোসো দেখাচ্ছি তোমাকে এর মজা।” বলেই তারা পাথর নুড়ি—যা হাতের কাছে পেলে, সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারতে লাগল। মধুর ক্ষীণ রোগা শরীর কতক্ষণ এ আঘাত সহ্য করবে বল—দেখ্তে দেখতে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তখন আর প্রাণ নেই। তবু পাহাড়ে মেয়েদের মনে দুঃখ হল না, তারা মধুর দেহটিকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিলে। নীচেই ছিল একটি নদী, নাম অশ্রুমতী। এই নদীর জলে দেহটি পড়বার সময় একটা শব্দ হল; শব্দটা যেন কেঁদে কেঁদে বল্লে, “হায় নান্দী! হায় নান্দী!” শুনে পাহাড় পর্ব্বত, তরুলতা পশুপাখী যারা মধুকে প্রাণের মতো ভালবাসত—সবাই যেন গলা ছেড়ে কেঁদে উঠ্ল।

কিন্তু এতদিনে মধুর দুঃখের দিন কেটে এসেছিল। তার আর রক্তমাংসের শরীর নেই—ছায়ার শরীর। সেই শরীর নিয়ে মধু বৈতরণীর তীরে পৌঁছতেই তারণ খাতির করে তাকে নায়ে তুলে নিলে। যমপুরীর দোরে সেই তেমাথা কুকুরটাও তাকে দেখে রেগে উঠ্ল না—আনন্দে ল্যাজ নাড়তে লাগ্ল। নান্দী আগে থাকতেই দোরের পাশে এসে চুপটি করে স্বামীর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল; যাই দেখ্লে দরজায় পা দিয়েছে, অমনি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্লে। যমপুরীর দুঃখ-শোকের ভিতর একটা আনন্দের কোলাহল জেগে উঠ্ল। *

* গ্রীসের পৌরাণিক গল্পের অনুসরণে—লেখক।

ঘরে আয়

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।]

বুকে ক্ষীর বয়ে যায়,
নীলমণি, ঘরে আয়
দুগ্ধভারের বেদনায়
বাণী কাতর আজ !
গোঠের খেলা হল নাকি
দিনের যে আর নাইক বাকী
পথের পরে আঁধার আঁখি,
ঐযে এল সাঁঝ।
দেখবিনাক কাঁটার ঘায়
ব্যথা কোথা বাজবে পায়
কে জানে বল ফণী কোথায়
লুকিয়ে বনের মাঝ,
নূপুর পায়ে আয়রে ছুটে
দূরে ধ্বনি শুনে উঠে
ধেয়ে, বাঁধব বক্ষ পুটে
বিলম্বে কি কাজ ?

পুসীর কীর্ত্তি

(শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী)

(১)

এক যে ছিল কলু। সে থাক্‌ত বনের ধারে পাহাড়ের গায়। চারদিকে মস্ত বড় বন—বাঘ, ভালুক, দেবনাগ, ভূতপ্রেত, হুরীপরী কতরকম যে সেই বনে ছিল। কেউ ভয়ে পাহাড়ে বনে যেত না। একা একা নিজের কুঁড়েতে কলু থাক্‌ত আর একমনে নিজের কাজ করে যেত, তুনিয়ার কাউকে সে ডরাত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাজার থেকে কলু বনের পথ দিয়ে বাড়ী ফির্‌ছে এমন সময় শুন্‌তে পেল একটা বেড়ালছানা কাতরভাবে খুব চেঁচাচ্ছে। সেদিকে যেতেই কলু দেখ্‌লে একটা প্রকাণ্ড কুকুর বেড়ালছানাটা কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করেছে একলাঠি লাগাতেই কুকুরটা বেড়ালটাকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গ্যাল। বেড়ালটা ছুটে এসে কলুর পায়ে মুখ ঘসে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জানাল।

তারপর সে বলে উঠ্‌ল—"কলু মশা'য় আমাকে এখানে ফেলে যাবেন না—দোহাই আপনার। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, আপনার কপাল আমি ফিরিয়ে দেব।"

কলু ত একেবারে অবাক্! বেড়াল কথা বলে একি ব্যাপার! যাহোক কলু বেড়ালকে নিয়ে চল্ল। কিন্তু যাবার সময় সাবধান ক'রে দিল যে সে যে কথা কইতে পারে এ কথা যেন কলুর ছেলেরা না জান্তে পারে।

পুসীও একথায় রাজী হ'য়ে কলুর সঙ্গে বাড়ী এল।

বাড়ীতে ঢুক্‌তেই কলুর তিনছেলে ছুটে এসে জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"বাবা এমন সুন্দর বেড়ালছানা কোথায় পেলে বাবা ?"

কলু বল্লে, "রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি। ঘরের এক কোণায় বেশ যত্ন ক'রে রাখ্‌বে একে, আর রোজ সকাল বেলায় একবাটি গরম তুধ খেতে দেবে।

(২)

কলুর বড় দুই ছেলে ছিল ভারী দুষ্টু; ছোটটি ছিল বেশ লক্ষ্মী। কলু বাড়ী না থাক্‌লে বড় দুজন বেড়ালটাকে ভারী জ্বালাতন কর্‌তে, কিন্তু ছোটটি ভাইদের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ত।

এ রকমে দিন যায়। কলুও বুড়ো হ'লো। মাথার চুল পাক্‌লো', গায়ের চাম্‌ড়া ঝুলে গ্যাল, কাজ কর্‌বার শক্তি কমে এল। একদিন শীতের রাতে বুড়ো মারা গ্যাল।

ছেলেরা তখন বড় হয়েছে। বুড়ো মর্‌বার সময় ছেলেদের ডেকে বড়জনকে ঘানিটী, মেজজনকে ঘানি ঘোরাবার গাধাটী ও ছোটজনকে বেড়ালছানাটী দিয়ে গ্যাল।

বাপের শ্রাদ্ধশান্তি হ'য়ে গেলে একদিন বড়ভাই ছোটভাইকে ডেকে বল্লে, "তোমার আমাদের বাড়ীতে থাকা হবে না। তুমি তোমার বেড়ালছান নিয়ে সরে পড়। মেজ থাক্—তার গাধাটা দিয়ে বেশ ঘানি ঘোরাণ যাবে।"

বড় ভাইএর কথা শুনে ছোটএর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে এখন কোথায় যায়? কি করে? মাথায় হাত দিয়ে বসে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ সে শুন্‌তে পেলে কে যেন তাকে বলছে "ভাবনা কিসের এত' আর মাথায় হাত বুলুচ্ছে। তাকিয়ে দেখে বেড়ালছানাটী কথা কইছে ও হাত বুলুচ্ছে। সেত অবাক্! বেড়ালছানা কথা বলে? বিস্ময়ে সে বেড়ালের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললে, "তুমি কে হে?"

বেড়ালছানা বল্লে, "আমি তোমার বাবার চাকর ছিলাম, এখন তোমার চাকর। দুঃখ করো না প্রভু। তুমি যদি আমার কথা শুনে চলো তবে তোমার অদৃষ্ট আমি ফিরিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা তাহ'লে কি করতে হবে আমাকে?"

"একজোড়া বুট্ ও একটা ভাল থলে' এনে দাও, দেখ আমি কি করি।"

ছোট ভাই বেড়ালের কথামত বুট্ ও থলে' কিনে এনে দিল।

সেদিন রাত্তিরে পুসীকে সঙ্গে করে ছোট বাড়ী ছেড়ে চলে গ্যাল। বনের পথ ধরে যেতে যেতে একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে দেখ্‌তে পেয়ে তাতেই তারা রাত কাটাল।

পরদিন সকাল বেলায় পুসী জুতো পরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, "কেমন দেখাচ্ছে আমায় ?"

ছোট বল্লে, "বেশ দেখাচ্ছে। কিন্তু কি করে অদৃষ্ট ফির্‌বে সেই উপায়টা বলে দাও দেখি একবার।"

বেড়াল হেসে বল্লে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই আমি বেরুচ্ছি—ঘুরে আসি, দেখো।"

এই বলে সে জুতো মস্ মস্ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল।

(৩)

বনে যেয়ে ব্যাগটা জালের মত করে ছড়িয়ে দিয়ে দুটো বড় বড় খরগোশ ধর্‌লে। তারপর খরগোশ দুটো ব্যাগে পুরে রাজার বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

রাজবাড়ীর দরজায় এসে দ্বারোয়ানকে বল্লে, "রাজাকে আমার সেলাম দাও। রাজার সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

দ্বারীত অবাক্! বুট পায়ে বেড়ালছানা, সেও আবার কথা বলে! দ্বারী রাজাকে জানালে। রাজাও ব্যাপার দেখ্‌বার জন্যে হুকুম দিলেন পুসীকে তাঁর সাম্‌নে হাজির কর্‌তে।

পুসী রাজার সাম্‌নে এসে সেলাম করে বল্লে, "মহারাজের জয় হোক্। আমি কার্‌বাসের রাজার দূত। তিনি মহারাজকে এই উপহার পাঠিয়েছেন।" এই বলে সে খরগোশ দুটো রাজাকে দিলে।

রাজা হেসে বল্লেন, "কারবাসের রাজা ভাগ্যবান্ বলতে হবে। তোমার মতো কথা কইতে পারে এমন বেড়াল যাঁর আছে তিনি ভাগ্যবান্ বই কি! আচ্ছা, তোমার রাজা আমার দরবারে আসেন না কেন?"

পুসীও হেসে বল্লে, "ও মহারাজ, তাও জানেন না। আমার রাজা রাজসভার এই সব হৈ চৈ মোটেই ভালোবাসেন না। তা যদি তিনি জান্তে পারেন যে, আপনি খুব ভালো লোক তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন।"

রাজা বেড়ালের খোসামদে ভারী সন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে একটা মোহর বক্‌শিস দিলেন। মোহরটা নিয়ে সেলাম করে পুসী মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিলে।

বাজারে এসে প্রভুর ও নিজের জন্যে খাবার কিনে আনন্দে সে কুঁড়েতে ফিরে এল।

তারপর দুজন পেট ভরে খেয়ে গল্প জুড়ে দিলে। পুসী আজ কি করেছে না করেছে সব বল্লে। তারপর ছোটকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, "এতো সামান্য কাজ, আমি যা বলি তাই যদি কর তবে রাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে ও অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে।"

পরদিন সকালবেলায় আগের দিনের মতো থলে' কাঁধে করে পুসী বেরিয়ে পড়্ল! সেদিন দুটো বড় বড় তিতির ধরে রাজার কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'লো।

সেদিন রাজা অনেকক্ষণ ধরে পুসীর সঙ্গে আলাপ কর্লেন। মেয়েকে ডেকে এনে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বিদায় নেবার সময় পুসীকে বলে দিলেন সে যেন তার রাজাকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

পুসী আস্বার সময় শুনে এল পরদিন রাজা মেয়েকে সঙ্গে করে নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন।

(৪)

পরদিন বেড়ালছানা ছোটকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গ্যাল।

ছোট নদীতে নাইতে নাবামাত্র পুসী তার জামাটামা সব লুকিয়ে রাখ্লো। ইতিমধ্যে রাজা মেয়ের সঙ্গে লোকলস্কর হাতী ঘোড়া নিয়ে সেদিকে বেড়াতে এলেন।

পুসী অমনি বিষম জোরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার সুরু করে দিলে, "মানুষ ডুবে যায়, কে আছে বাঁচাও, কে আছে বাঁচাও!"

রাজা তাই শুনে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন! রাজার লোকেরা ছোটকে জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে এল। এখন তার জামা কাপড় কেথায় গ্যাল?

পুসী জোর গলায় বল্তে লাগ্ল, "কি রকম রাজার দেশ—জামা কাপড় চুরী করে নিয়ে যায়?"

এদিকে ছোট শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে। রাজা হুকুম দিলেন শীগ্‌গীর প্রাসাদ থেকে একটী ভালো গরম পোষাক এনে দিতে। অমনি ঘোড়সওয়ার ছুটে গ্যাল। সুন্দর পোষাক এল।

ছোট দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী ছিল। রাজপোষাক পরে তাকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছিল।

রাজা ডেকে তাকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিলেন।

পুসী তখন বল্লে, "আমার পেছন পেছন গাড়ী চালাও।"

পুসীর পেছন পেছন গাড়ী চল্লো। পুসী যেতে যেতে পথের দুধারে সকলকে শিখিয়ে দিলে বল্‌তে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস্ করে রাজত্ব কার অমনি যেন তারা বলে এসব কার্‌বাসের রাজার।

এই রকম করে যেতে যেতে অনেক দূরে সে এসে পড়্‌ল। রাজাও লোক লস্কর নিয়ে পেছ্‌ন পেছ্‌ন আস্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত।

এই প্রাসাদ এক মায়াবী দৈত্যের। পুসী প্রাসাদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিতেই দৈত্য এসে তার সুমুখে হাজির। সে পুসীকে দেখে রেগে বেগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বল্লে, "কি চাও হে তুমি?"

পুসী গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লে, "আমি কারাবাসের রাজার মন্ত্রী। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই মনে কর্‌লাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

দৈত্যও সব্বাইরই মতো বেড়ালকে কথা কইতে দেখে অবাক হ'য়ে গ্যাল।

এত বড় প্রাসাদ, এত ধনদৌলত দেখে পুসীও অবাক হ'য়ে গ্যাল। সে ভাব্‌লে "ওঃ, এই সব যদি আমার প্রভুর হতো!"

সে মনে মনে ফন্দী এঁটে বল্লে, "শুন্‌তে পাই তুমি নাকি ইচ্ছে কর্‌লে যে কোনও রূপ ধর্‌তে পার! আচ্ছা একবার সিংহ হও দেখি।"

দৈত্য বুক চাপ্‌ড়ে বল্লে, "বহুৎ আচ্ছা, এই ছাখো" এই বলে সে সিংহমূর্ত্তি ধর্‌লে। ওঃ সে কি বিরাট মূর্ত্তি! দেখ্‌লে লোকের পিলে অবধি চম্‌কে ওঠে।

পুসী বল্লে, "আচ্ছা, বেশ বড় জানোয়ারতো হতে পার দেখ্‌ছি, ছোট জানোয়ার—এই মনে কর ইঁদুর হতে পার কি?"

এবারও দৈত্য বুক চাপ্‌ড়ে বল্লে, "এই দেখো হচ্ছি।" এই বলে সে ইঁদুরের মূর্ত্তি ধর্‌লে। পুসী অম্‌নি যেয়ে তাকে ঘাড় মট্‌কে মেরে ফেল্লে।

তখন তার ফুর্ত্তি দেখে কে? বুক ফুলিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

রাজা লোকজন নিয়ে এসে পৌঁছুলেন। পুসী বল্লে, "এই আমার রাজার বাড়ী।"

"এত বড় বাড়ী কার্‌বাসের রাজার! তার কাছে আমি কত ছোট!" এই ভেবে মহারাজ হেঁটমুখ হলেন। তারপর গাড়ী থেকে নেমে সব দেখে শুনে আরও অবাক হয়ে গেলেন। কার্‌বাসের রাজাকে তাঁর প্রাসাদে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন কা গলেন।

রাজা চলে গেলে পুসী সবকথা ছোটকে বল্ল।

(৫)

রাজা বাড়ী ফিরে যেয়ে রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে কার্‌বাসের রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ঠিক্ কর্‌লেন।

ভালো দিন দেখে ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গ্যাল। কতদিন ধরে কত গরীব দুঃখী খেল, কাপড় পেল ও বরকনেকে মন খুলে আশীর্ব্বাদ করে গ্যাল।

কার্‌বাসের রাজা মনের আনন্দে সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। পুসী মন্ত্রী হ'য়ে রাজ্য চালাতে লাগ্‌ল।

প্রভুর ছেলেদের হাত ধরে রাণীর সঙ্গে পুসী যখন বেড়াত তখন দেখ্‌তে ভারী মজা হতো।

পুসী আজীবন কার্‌বাসের রাজার বন্ধু ছিল। এমন বন্ধুত্ব দুর্লভ।

গাছের বংশ বিস্তার

[শ্রীজগদানন্দ রায়]

আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সব আম খাই, তাহাদের আঁঠি বাড়ীর আঙিনার এক ধারে গাদা করিয়া রাখি। আষাঢ় মাসে বৃষ্টির জল পাইয়া সেগুলি হইতে অনেক চারা সেই জায়গায় বাহির হয়। কিন্তু ঘেঁসা-ঘেঁসিতে একটি চারাও বেশি দিন বাঁচে না। তাই আমের বাগান করিতে হইলে, সেই সব চারাকে উঠাইয়া বাগানে কুড়ি পঁচিশ হাত অন্তর পুঁতিতে হয়। ইহাতে সেগুলি ডাল-পালা ও শিকড় ছড়াইবার জায়গা পায় এবং মাটির তলায় খাবার পাইয়া তাড়াতাড়ি বড় হয়।

তোমাদের বাগানের জামগাছ-তলায় বর্ষাকালে হাজার হাজার জামের চারা বাহির হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায়, তাহাদের প্রায় সবগুলিই মরিয়া গিয়াছে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? গাছের আওতায় আলো ও খাদ্যের অভাবে উহারা মরে। তাই বাগানে নূতন জামের গাছ তৈয়ারি করিতে হইলে

গাছতলার ছোটো চারাগুলিকে ফাঁকা জায়গায় লইয়া গিয়া দূরে দূরে পুঁতিতে হয়। এই রকমে পোঁতা হইলে গাছ ক্রমে বড় হয় ও তাহাতে ফল ধরে।

মানুষ বুদ্ধিমান্ প্রাণী, তাই তাহারা ফাঁক ফাঁক করিয়া চারা পুঁতিয়া বাগান তৈয়ারি করে। যেখানে মানুষ বাস করে না, এমন জায়গার বনে কি রকমে গাছের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং হাজার হাজার নূতন গাছ জন্মায়, তাহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? গাছের বংশবিস্তারের জন্য সেখানে মানুষের বুদ্ধির দরকারই হয় না। গাছের জ্ঞান বুদ্ধি নাই এবং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার শক্তিও নাই। তাই জল, বাতাস, পশু, পাখী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া নানা রকমে গাছের বংশ বিস্তারের সাহায্য করে।

কি রকমে গাছের বংশবিস্তার হয়; এখন সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

কৃষকেরা তাহাদের ফসলের ক্ষেতে কি রকমে বীজ ছড়ায় তোমরা কেহ কেহ তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। হাতের মুঠোর মধ্যে বীজ লইয়া তাহারা উহা চষা মাটির উপরে ছিটাইয়া দেয়! ইহাতে বীজগুলি এক জায়গায় না পড়িয়া ক্ষেতের উপরে ফাঁক ফাঁক হইয়া সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। এইজন্যই ফসলের ক্ষেতে ধান, গম, বা সরিষার গাছ ঘন ঘন হইয়া জন্মে না। কতকগুলি গাছ তাহাদের পাকা ফলের বীজ কতকটা ঐ রকমে ছড়াইয়া ফেলে। আমরুল ও দোপাটির গাছ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব গাছের ফল পাকিলে সেই সকল ফল পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র সেগুলির ভিতরকার বীজ ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িতেছে। বীজগুলি যাহাতে গাছের তলায় আওতায় পড়িয়া নষ্ট না হয়, সেই জন্যই বীজ ছুড়িয়া ফেলিবার এই প্রকার ব্যবস্থা আছে।

আমরা কেবল আমরুল ও দোপাটির ফলের কথা বলিলাম, খোঁজ করিলে তোমরা আরো অনেক গাছকে ঐ রকমে বীজ ছুড়িতে দেখিবে। অপরাজিতার শুক্‌না পাকা ফল ফট্ ফট্ শব্দে ফাটিয়া যায় এবং তাহার বীজ দুই তিন হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়ে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাই বাগানে একটা অপরাজিতার গাছ থাকিলে, দূরে দূরে অনেক নূতন চারা জন্মিতে দেখা যায়।

পটপটে ফল তোমরা দেখ নাই কি? ঝোপ্ জঙ্গলে এই গাছ অনেক দেখা যায়। তাহার ছোট ছোট ফলগুলি দেখিতে ঠিক্ যবের মত। এই সকল পাকা ফলে জলের ছিটা দিলে, ফল ফাটিয়া যায় এবং ভিতরকার বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

কাপাস, শিমুল ও আকন্দ প্রভৃতির বীজ যাহাতে গাছ হইতে দূরে যায়, তাহার জন্য যে কি ব্যবস্থা আছে, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। এই সব বীজের কাহারো গায়ে, কাহারো মাথায়, তুলা লাগানো থাকে। তুলা খুব হাল্‌কা জিনিস! তাই বাতাস লাগিলে উহা এক জায়গায় স্থির থাকে না। কাজেই কাপাস, আকন্দ প্রভৃতির বীজ উড়িতে উড়িতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে! মাথায় ঝুঁটিওয়ালা আকন্দের বীজকে আমরা এক ক্রোশ দূরে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। সূর্য্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতির বীজে ঝুঁটির বদলে কাগজের চেয়েও হাল্‌কা এক একটা অংশ জোড়া থাকে, তাহাই বাতাসে উড়িয়া বীজগুলিকে দূরে ছড়াইয়া দেয়।

শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখ্‌না তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে। শালের ফলে পাঁচটা ও মাধবীলতার ফলে তিনটা পাখ্‌না লাগানো থাকে। শালের ফল দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহা ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলার পালক লাগানো বল্। শুক্‌না ফলগুলি গাছ হইতে ঝরিয়া কখনই গাছতলার ছায়ায় পড়ে না, নাটুর মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেগুলি গাছ হইতে প্রায় আট দশ হাত তফাতে আসিয়া নামে। কাজেই বলিতে হয়, শাল ও মাধবীলতার ফলের পাখ্‌নাই ফলগুলিকে ছড়াইয়া দেয়।

ফল ও বীজ যেমন বাতাসে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি সেগুলি জলের স্রোতেও দূরে ভাসিয়া যায়। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? শুক্‌না পাকা নারিকেল ও সুপারির গায়ে যে পুরু ছোব্‌ড়া আছে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস থাকে। তাই জলে পড়িলে এই সব ফল ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রের ধারের গাছ হইতে যে নারিকেলগুলি জলে পড়ে, তাহা অনেক সময়ে এই রকমে জলে ভাসিয়া এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে হাজির হয় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের উৎপত্তি করে। পিটুলি ও কল্‌কে ফুলের গাছে খাল, বিল ও নদীর ধারেই বেশি হয় এবং ইহাদের পাকা ফল প্রায়ই জলে ঝরিয়া পড়ে। এগুলিও নারিকেলের মত ভাসিয়া দূরে নূতন গাছের সৃষ্টি করে। একটু লক্ষ্য করিলে তোমরা আরো অনেক গাছের ফলকে এই রকমে দূরে ভাসিয়া যাইতে দেখিবে।

তোমাদের বাগানের গাছে যে সব হল্‌দে সিঁদুরে রঙের পাকা আম ও লাল টুকটুকে লিচু গাছে গাছে ঝুলিয়া থাকে, তাহাদের এমন সুন্দর রঙ্ কেন হয়,

কলুর তিন ছেলে ছুটে এল

1.

"কে আছে বাঁচাও"

...ঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ১৮৬।২২

প্রভাতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

সম্পাদক—শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

বার্ষিক মূল্য ২॥৵০ আনা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা,

বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, নিশিকান্ত সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি প্রভাতীতে নিয়মিত লেখেন।

প্রতি সংখ্যায় বহু ছবি থাকে

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা সংশোধন করিয়া ছাপা হয়

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং (দোতালা) কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

১৩২৯

দাম	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
চব্বিশ	শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়
আনা	সম্পাদিত

এখন তোমরা আন্দাজ করিতে পারিবে। এই সব ফল ভয়ানক ভারী, কাজেই বাতাসে সেগুলিকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না, তাই বীজ ছড়াইবার জন্য পশুপক্ষী ও মানুষের সাহায্য দরকার হয়। পাখী, কাঠবিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীরা সুন্দর রঙ্ দেখিয়া এই সব ফলের কাছে যায় এবং তা'র পরে ঠোকর মারিয়া যখন স্বাদ বুঝিতে পারে, তখন পেট ভরিয়া সেগুলিকে খায় এবং শেষে আধ্ খাওয়া ফল, মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। এই রকমের নানা জন্তু জানোয়ারের সাহায্যে আম, জাম, লিচু, বট, অশথ, পেয়ারা, বাদাম, কুল, লেবু, সুপারি, তেলাকুচা, লঙ্কা, নিম ও বকুল প্রভৃতি কত গাছের ফল ও বীজ যে দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না।

তালের ফল প্রকাণ্ড বড়, তাই পাখী, ইঁদুর বা কাঠবিড়ালে এগুলিকে দূরে লইয়া যাইতে পারে না। ভাদ্র মাসে পাকা তাল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িলেই গরু-বাছুরেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহা খায় এবং আঁশওয়ালা আঁঠিগুলির ঝুঁটি মুখে করিয়া সেগুলিকে দূরে ছড়াইয়া ফেলে।

সুতরাং দেখ, ফলের সুন্দর রঙ্ এবং সুমিষ্ট শাঁস তোমার বা আমার জন্য নয়। পশুপক্ষীদের ডাকিয়া আনিবার জন্যই ফলের ভিতরে ও বাহিরে এমন রঙের চট্‌ক ও সুস্বাদ থাকে।

পেয়ারা অশথ, বট ও নিম প্রভৃতির ছোট বীজ বড় শক্ত। পাখী বা অপর জন্তুরা এই সকল বীজ গিলিয়া হজম করিতে পারে না। কাজেই মলের সঙ্গে সেগুলি যেখানে পড়ে সেখানেই অঙ্কুরিত হয়। এই রকমে পাকা প্রাচীরের ফাটালে, এমন কি দোতলা তেতলা পাকা বাড়ীর মাথায় এবং মন্দিরের চূড়ায় আমরা বট, অশথ ও নিম প্রভৃতি গাছ জন্মিতে দেখি।

কুঁচের ফল পাকিলে তাহা কি রকমে ফাটিয়া যায়, তাহা হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। ফলের জোড়ের মুখ চিরিয়া ফাঁক হইয়া যায়, কিন্তু সেই ফাঁক দিয়া কুঁচগুলি মাটিতে পড়ে না। পাখীরা চেরা ফলের ভিতরে লাল টুক্‌টুকে কুঁচগুলিকে সাজানো দেখিয়া সেগুলিকে গিলিয়া ফেলে, কিন্তু হজম করিতে পারে না। তার পরে সেগুলি যেখানে পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে সেখানেই তাহারা অঙ্কুরিত হয়।

ঘাসের যে ফলগুলিকে আমরা ভাঁটুই ও চোরকাঁটা বলি, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই ঘাসের উপর দিয়া গেলেই কাপড়ে চোরকাঁটা ফুটিয়া যায়। সেগুলিতে ছুঁচের মতো সরু শুঁয়া লাগানো থাকে। কাপড়ে লাগিলে সেগুলিকে যতক্ষণ ছাড়ানো না যায়, ততক্ষণ কাঁটার খোঁচা সহ্য করিতে হয়। গায়ের লোমে আটকাইলে গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্তুরাও চোরকাঁটার খোঁচা খায়। কাজেই তখন উহারা দূরে পালাইয়া গা ঝাড়া দিয়া সেগুলিকে ছিট্কাইয়া ফেলে। তাহা হইলে দেখ, চোর কাঁটা প্রভৃতির ছুঁচের মতো হুলটিও তাহাদের বংশবিস্তারের জন্য।

যাহারা পশুপক্ষীর গায়ে বীজ আট্কাইয়া বংশবিস্তার করে, সে সকল ফল আরো অনেক আছে। আপাং অর্থাৎ চিড়্চিড়ের পাকা ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? গরু বাছুরের গায়েও আমরা এগুলিকে আট্কাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

আটা লাগানো বীজ তোমরা দেখ নাই কি? বেল, পরগাছা জাতীয় বাঁদ্রা, চাল্তা এবং সোঁদালের বীজে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। বেলের খোলা পুরু তাই পাখীরা গাছ হইতে ইহা খাইতে পারে না। বেল পাকিয়া মাটিতে পরিলেই তাহা চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায়। তার পরে গরু বাছুর ও পাখীরা যখন সেই ভাঙা বেল খাইতে আরম্ভ করে, তখন আঠাওয়ালা বীজগুলি তাহাদের গায়ে মুখে লাগিয়া যায়। সেগুলি শরীর হইতে যেখানে ঝরিয়া পড়ে, সেখানেই তাহাদের গাছ হয়। সোঁদালের লম্বা লম্বা সুঁটির মধ্যে যে কালো রঙের আঠালো বীজ থাকে তাহার মিষ্ট স্বাদ আছে। ইহার বীজও ঠিক ঐ রকমে গরু বাছুরে ও পাখীতে ছড়াইয়া ফেলে।

মাঁদা বা বাঁদরার ফলের শাঁস ভয়ানক আঠালো, কিন্তু মিষ্ট। তোমাদের বাগানে বুড়ো আম গাছের ডালে খোঁজ করিলেই, তোমরা দুই চারিটি বাঁদরার গাছ দেখিতে পাইবে। পাখীরা ইহার ফল খাইতে বড় ভালবাসে। খাবার সময় ভিতরকার আঠায় যে সকল বীজ ঠোঁটে ও মুখে লাগিয়া যায়, ঠোঁট্ ঘষিবার সময়ে পাখীরা সে গুলিকে অন্য গাছের ডালে লাগাইয়া দেয়। এই রকমে বাঁদরের বীজ এক গাছ হইতে অন্য গাছে গিয়া সেখানে বংশ বিস্তার করে।

গাছের বংশবিস্তারের কেবল কয়েকটি উপায়ের কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি ছাড়া আরো নানা উপায় আছে। তোমরা যখন বাগানে বেড়াইবে তখন লক্ষ্য করিয়ো, তখন দেখিতে পাইবে নানা গাছে নানা উপায়ে তাহাদের বংশ-বিস্তার করে।